প্রথম বর্ষ ॥ ষষ্ঠ সংখ্যা ॥ আশ্বিন ॥ ১৩৮২

আনন্দমেলা

উৎসবের দিনে ছেলেমেয়েদের সঙ্গী

বিনী প্রিন্টস্

সাজগোজের বাহার ছেলেমেয়েদের জন্যেই। রঙবেরঙের চমকদার জামাকাপড় পরে দৌড়ঝাঁপ করার এই তো বয়স। আর সেই জন্যেই বিনী প্রিন্টস্-এর কদর এত বেশি। লোকের চোখে পড়ার মতো, মনে ধরার মতো বাহারী নকশার জন্যেই বিনীর

এতো নামডাক। বিয়ে বাড়িই বলুন বা অন্য কোন উৎসবই বলুন—ছেলেমেয়েদের জমজমাট সাজগোজের জন্যে বিনী প্রিন্টস্ না হলেই নয়।

বিনী

ছেলেমেয়েদের মনের মতো
সূতী কাপড়

BCCM-43.75 BEN

আনন্দমেলা

প্রথম বর্ষ ॥ ষষ্ঠ সংখ্যা
আশ্বিন ॥ ১৩৮২
দেড় টাকা

ছড়া	নাও ভাসান। অন্নদাশঙ্কর রায় ৪
উপন্যাস	রাজা হওয়ার ঝকমারি। বিমল মিত্র ১৬
	কাপালিকরা এখনও আছে। বিমল কর ২৪
গল্প	কুহু-কেকা সংবাদ। জরাসন্ধ ১২
	হোঁদল কুতকুতে। মনোজ বসু ২১
	ছুটির দিনের ছবি। তারাপদ রায় ৩০
	সাধু কালাচাঁদের নতুন কাজ। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩
জীবন-কথা	শরৎ-কথামালা। অরবিন্দ গুহ ৩৭
ইতিহাসের গল্প	আর্থারের মৃত্যু। উমা দাশগুপ্ত ৪৮
প্রকৃতি-বিজ্ঞান	ঋতুর নাম শরৎ। সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৮
কমিকস	টিনটিন। কাঁকড়া-রহস্য ৬, ৭, ১০, ১১
	টারজান। ৪৬, ৪৭, ৫০, ৫১
খেলাধুলো	ময়দানের ফুটবল। স্ট্রাইকার ৪২
	ফুটবলে সেরা শম্ভু ৪৫
নিয়মিত বিভাগ	ধাঁধা ৫, আচ্ছা বলো তো ৫
	ম্যাজিক। পি সি সরকার জুনিয়ার ১৫
	ম্যাজিকের মতো ১৫
	জাদুঘর। শ্রীপান্থ ২০
	জানা না-জানা ২৯
	অঙ্কের মজা, মজার অঙ্ক ৩২
	বিন্দুবিসর্গ। ইন্দ্রমিত্র ৩৬
	আজব চিড়িয়াখানা। বহুরূপী ৫২
	তোমাদের পাতা ৫৩
	রাজায় রাজায় ৫৪
	মণিমেলার খবর ৪১
প্রচ্ছদ	সমর দাশ

সম্পাদক ॥ অশোককুমার সরকার
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট
লিমিটেড এর পক্ষে অক্ষয়কুমার
চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার
স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে
প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট
লিমিটেড, পি ২৪৮ সি. আই. টি রোড,
কলিকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

ছবি এঁকেছেন ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী

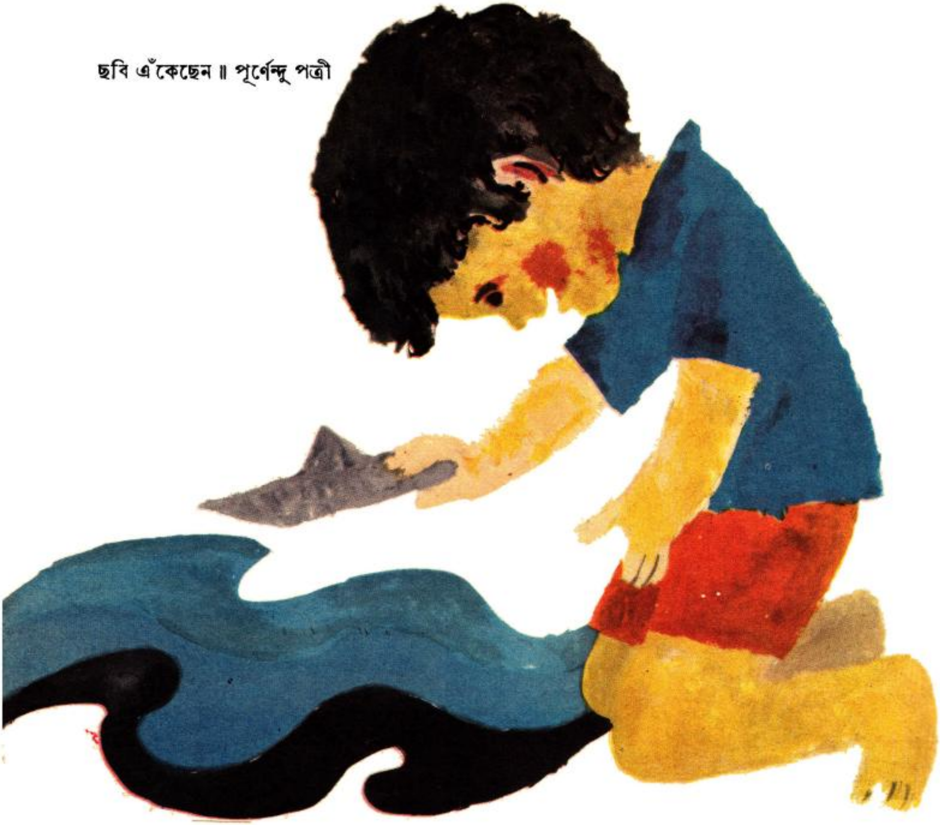

নাও ভাসান

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রথম যেদিন নামে ঢল
নয়ানজুলিতে আসে জল।
বাড়ির সামনে দেখি
বাঃ ভোজবাজি এ কী!
নদী বয়ে চলে কলকল
বাড়ির সামনে হাঁটুজল।

কাগজকে কেটে করি চৌকা
বানাই সাধের যত নৌকা
তারপর কৌশলে
ভাসাই নদীর জলে
ছেলেবেলা সে কেমন মওকা!
লাল নীল কাগজের নৌকা।

কিছু দূরে গিয়ে নাও টোল খায়
আরো দূরে আরেকটা ওলটায়।
নয়ানজুলির জলে
সপ্ত ডিঙ্গা চলে
একটি কি পৌঁছবে লঙ্কায়!
বুক করে দুরুদুরু শঙ্কায়।

আমিও যেতুম চলে সঙ্গে
বাইতে বাইতে তরী রঙ্গে।
তখন ছোট্ট আমি
দোরগোড়াতেই থামি
জল-কাদা মাখি সারা অঙ্গে।
বড়ো হলে চলতুম সঙ্গে।

ধাঁধার পাতা

বিকেল থেকেই লোডশেডিং। হ্যারিকেনের আলোয় কাঁহাতক পড়াশুনা চালানো যায়। বইপত্র গুটিয়ে ছোট্‌কার খোঁজে গেলাম।

গিয়ে দেখি, চিলেকোঠার ঘরে একটা ইজিচেয়ারে আরাম করে শুয়ে আছে ছোট্‌কা। আমি ঢুকতেই ঠাহর করে ছোট্‌কা বলল, "পড়া শেষ? টুলটা নিয়ে এসে পাশে বস।"

ছোটকার পাশে গিয়ে বসলাম। সারা পাড়া জুড়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু দূরের একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে ক্ষীণ আলো জ্বলছে। জানলা দিয়ে দেখা যায়।

ছোট্‌কা হঠাৎ ওই বাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, সারা পাড়ায় যখন লোডশেডিং, তখন ওই বাড়িটায় কী করে আলো জ্বলছে, বলো তো সত্যবাবু?"

উত্তরটা আমার জানা। ওই বাড়িতে লোডশেডিংয়ে কোনোদিনই আলো নেবে না। এ-নিয়ে অনেক আলোচনা শুনেছি। চটপট জবাব দিলাম, "ও-বাড়িতে ডি সি কারেন্ট, তাই।"

"কী বললি? ডি সি কারেন্ট!" ছোট্‌কা প্রথমে হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর চকিতে আমার চুল ধরে নাড়াতে লাগল। "তুই তো আমাদের আপিসের ভোলাবাবু হয়ে গেলি! ডি সি কারেন্ট কী রে?"

আমার খুব খারাপ লাগছিল। একটু জোর দিয়েই বললাম, "হ্যাঁ, ডি সি কারেন্ট। আমি জানি।"

"তুমি কিচ্ছু জানো না। ডি সি মানে কী?"

"জানি না।" ক্ষুব্ধ গলায় আমার জবাব।

"সত্যিই জানো না। এ সি হল অলটারনেট কারেন্ট, ডি সি মানে ডাইরেক্ট কারেন্ট। সুতরাং এ সি বা ডি সি বলাই যথেষ্ট। এ সি কারেন্ট বা ডি সি কারেন্ট বলাটা বোকামি।"

এবারে সত্যি লজ্জা পেলাম। ছোট্‌কার দিকে মুখ না তুলেই বললাম, কিন্তু এ-রকম ভুল তো আমরা হামেশাই করি। না ছোট্‌কা?"

"তা তো বটেই। তবে আমাদের আপিসের ভোলাবাবু এ-ব্যাপারে টপ। দাঁড়া, আলোটা আসুক, ভোলাবাবুর বলা ও লেখার কিছুটা নমুনা তোকে দেখাব।"

এবারের **প্রথম ধাঁধার** নাম দেওয়া যাক, ভোলাবাবুর ভুল। ইংরেজী আর বাংলা মিশিয়ে যেমন ভুল বলেন, তেমনই লেখেন ভোলাবাবু। তাঁর দিনপঞ্জীর অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি। তোমাদের কাজ হবে চটপট ভুলগুলো বার করে ফেলা।

"ভাইপোটি রয়েছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। অ্যাপেনডিসাইটিস অপারেশন হবে। তার আগে অবশ্য ব্লাডপ্রেসার আছে কিনা দেখবে।...

বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা বাস পেলাম। ভায়া শিয়ালদা হয়ে যাচ্ছে। আপ টু বৌবাজার অবধি গিয়ে বাকিটুকু হেঁটে যাব। শ্যামবাজারের মোড়ে এসে বাস গেল থেমে। চৌমাথায় বিরাট জাম্প। ইন কেস যদি দেরী হয়ে যায়—এই ভেবে নেমে পড়লাম। বিধান স্মরণী দিয়ে হেঁটে ট্রামডিপোয় পৌঁছে একটা ট্রামে উঠলাম। বেশ ভিড়। লেডিজ সিট ফাঁকা পেয়ে বসেছি, পরের স্টপেজে এক ভদ্রমহিলা উঠলেন। লেডিজ উঠেছে দেখে সিট ছেড়ে দিতে হল।..."

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ সোজাসুজি গেলে
তিব্বতে পাবে
উল্টে নিয়েই গলায় দোলাবে।

তৃতীয় ধাঁধা ॥ পাঁচখানা নয় নাও,
পুরোতে দশ বানাও॥
(ভগ্নাংশ চলবে)

চতুর্থ ধাঁধা ॥ দশ খণ্ড রচনাবলী সাজানো ছিল বইয়ের তাকে। পাশাপাশি। প্রতি খণ্ডে ১০০ পৃষ্ঠা। একটি পোকা প্রথম খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কুরে খেয়েছে। কত পৃষ্ঠা সে খেল? মলাট বা পুস্তানির পাতা হিসেবের মধ্যে ধরার দরকার নেই।

গতবারের ধাঁধার উত্তর ॥ **প্রথম ধাঁধা**। ছেলেমেয়েদের বয়স ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ এবং ১৩। এর মধ্যে শুধু ৬ আর ৪ মিলে দশ হয়। সুতরাং এক বাড়ির ভাইবোনের বয়স ৬ এবং ৪ ॥ জোড়-বয়স ২৩ হতে পারে ১০ ও ১৩ মিলে, অথবা ১১ ও ১২ মিলে। প্রথমটি হলে, ২২ জোড় বয়স বার করা যায় না। কেননা ২২ মানে ৯ আর ১৩, অথবা ১০ এবং ১২। সুতরাং ২৩ যে-ভাইবোনেব জোড় বয়স, তাদের একজন ১১, অন্যজন ১২। ২২ যাদের, তারা হল ৯ আর ১৩র যোগফল।

চারজন রইল। তাদের বয়স ৫, ৭, ৮, ১০। যেহেতু এর মধ্যে দু-জনের জোড় বয়স ১৩, অন্য দুজনের ১৭, সুতরাং ৫ ও ৮ ভাইবোন, ১০ ও ৭ ও তাই। সুতরাং যে ছেলেটির বয়স ৭, তার বোনের বয়স ১০। দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কমলা। তৃতীয় ধাঁধা ॥ গালিচা। চতুর্থ ধাঁধা ॥ ১, ২ ও ৩ ॥

—**সত্যসন্ধ**

আচ্ছা বল তো

প্রঃ কী খোকন, ইস্কুল কেমন চলছে?

উঃ চলছে কোথায়? দাঁড়িয়ে আছে।

প্রঃ কী খেলে পেট তো ভরেই না, উল্টে মনখারাপ হয়?

উঃ চড়।

প্রঃ সবুজ গাছের পাতায় রোদ পড়ে কেন?

উঃ সালোক সংশ্লেষ হবে বলে।

প্রঃ শান্তশিষ্ট কাজটি কাহার?

উঃ সুধীর কর্মকার।

প্রঃ মুরগী কেন গাছে ওঠে?

উঃ বাঃ, নাহলে ডিমটা পাড়বে কোত্থেকে?

প্রঃ কী করলে পরের যাত্রা পণ্ড হয়?

উঃ নিজের নাক কাটলে।

প্রঃ ঠাণ্ডা লাগলে ওজন বাড়ে কেন?

উঃ মাথা ভার হয় বলে।

প্রঃ কোন্ পাখি পাখি নয়?

উঃ উটপাখি।

প্রঃ মানুষ কখন মাছের মত খেতে হয়?

উঃ রোদে ভাজা-ভাজা হলে।

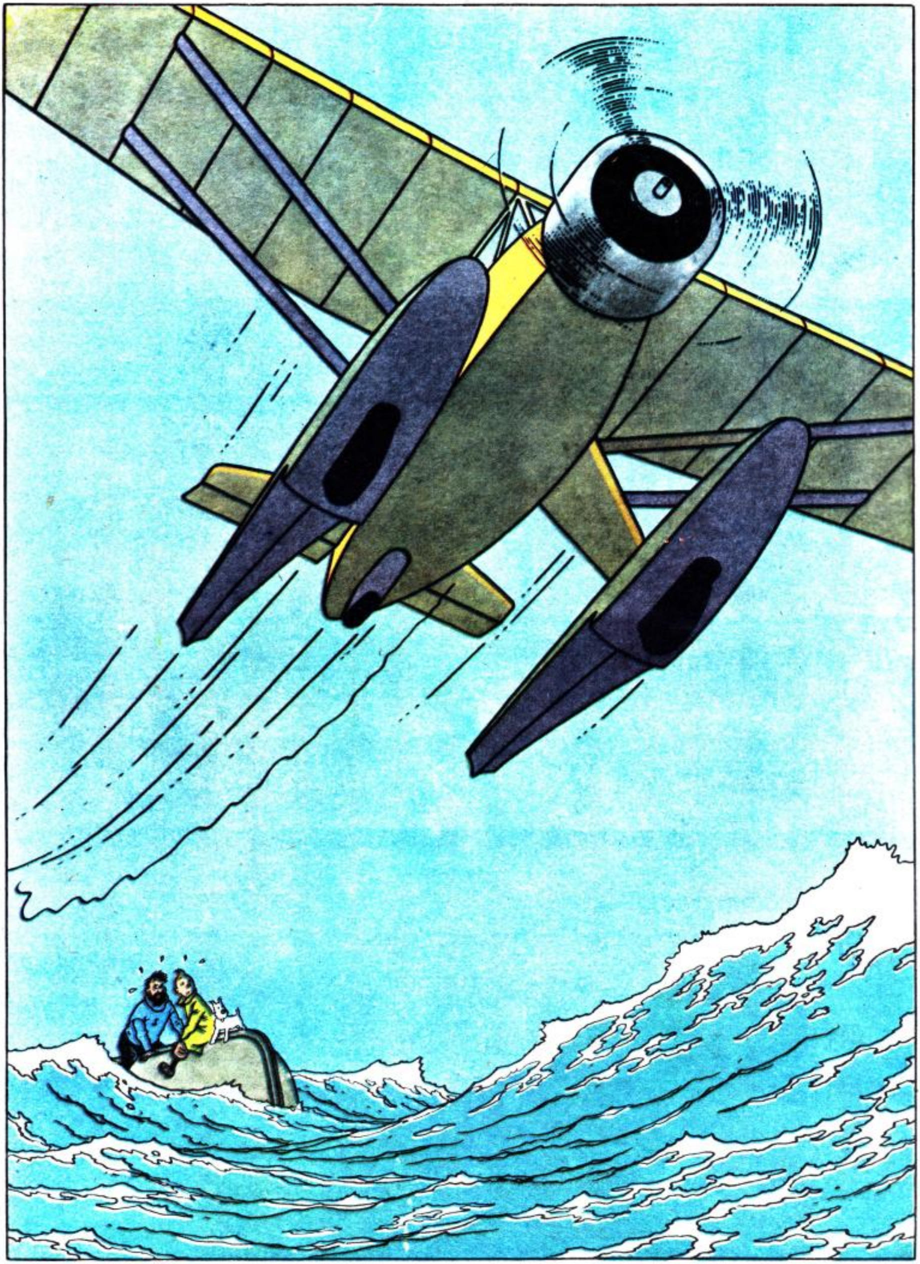

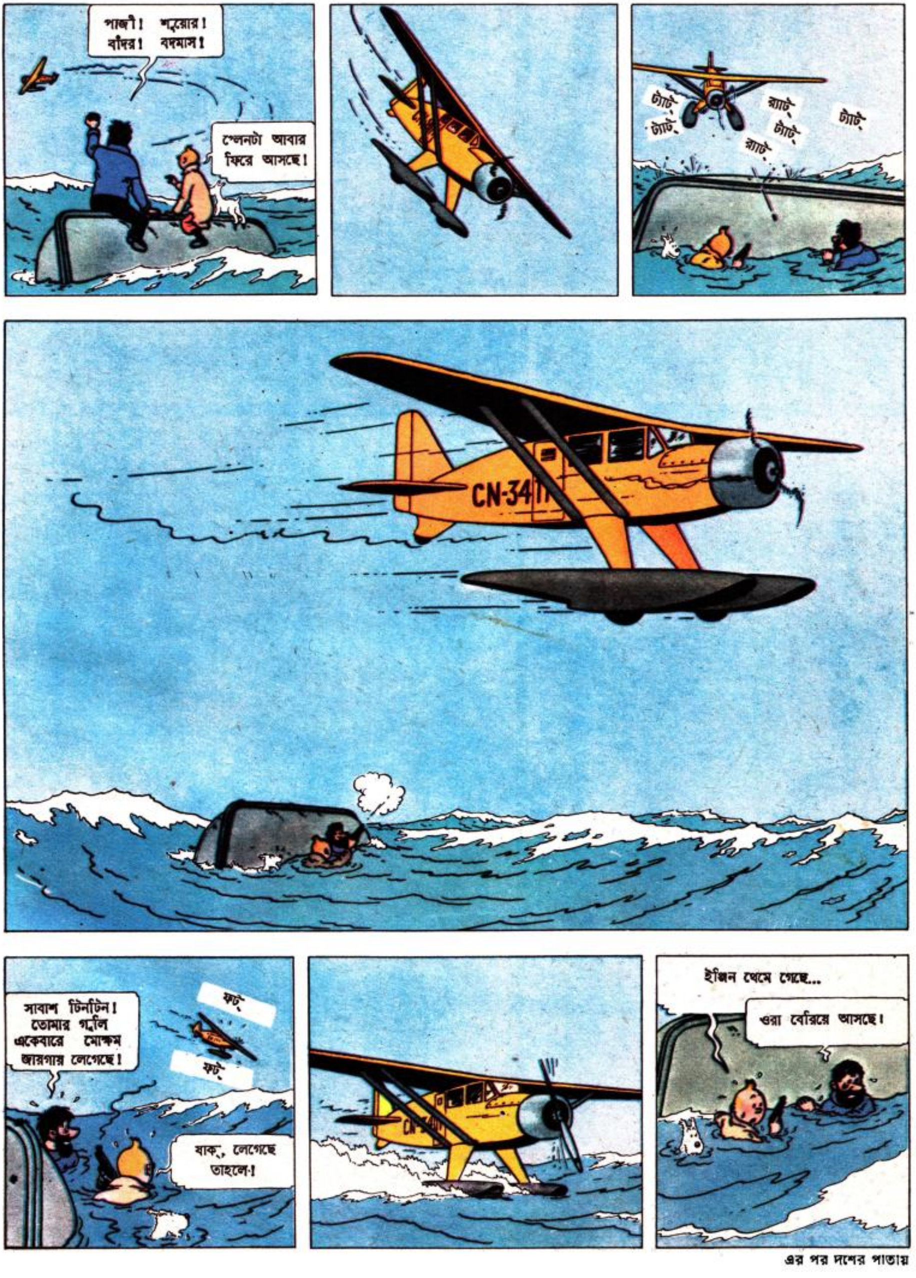
পাজী! শুয়োর!
বাঁদর! বদমাস!
প্লেনটা আবার ফিরে আসছে!
ট্যাট্
ট্যাট্
র‍্যাট্
ট্যাট্
র‍্যাট্
ট্যাট্
CN-3411
সাবাশ টিনটিন! তোমার গুলি একেবারে মোক্ষম জায়গায় লেগেছে!
ফট্
ফট্
যাক্, লেগেছে তাহলে!
ইঞ্জিন থেমে গেছে...
ওরা বেরিয়ে আসছে।

এর পর দশের পাতায়

ঋতুর নাম শরৎ

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

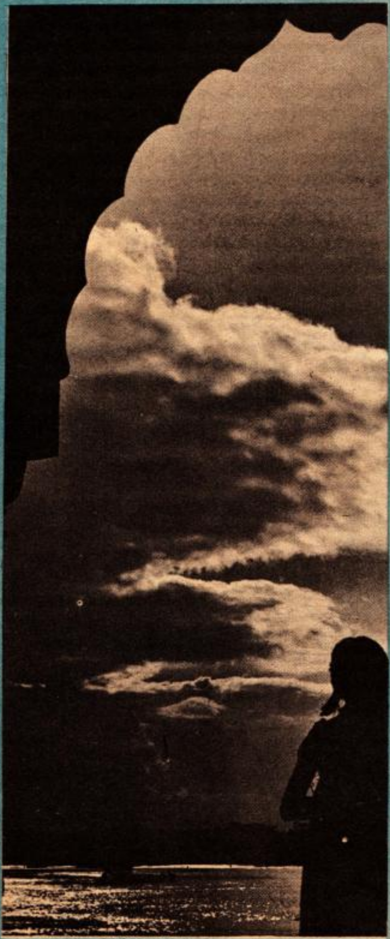

ক'দিন ধরে ভীষণ গুমোট পড়েছে। এক ফোঁটা বাতাসও নেই। মাথার ওপরে এক-আধটা শাদা মেঘ। কিন্তু মেঘগুলো একটুও নড়ে না চড়ে না, ছবির মেঘের মতো একদম স্থির। শাদা শাদা মেঘের ওপরে নীল আকাশ। সেই নীলও এত পরিষ্কার যে তার ভেতর দিয়ে আকাশের ওপরে আকাশ, আরও ওপরের আকাশ, সবচেয়ে উঁচু আকাশের ঘন নীলটা পর্যন্ত দেখা যায়।

চারদিকে কী ঝকঝকে রোদ্দুর। তাতে একটুও ঘোলাটে ভাব নেই. তার ঝাঁঝও যেন অনেক কম। ধোয়া মোছা কাচের গেলাসে একেবারে পরিষ্কার টলটলে জলের মতো রোদ্দুর পথে ঘাটে ঘাসে গাছে দেওয়ালে বারান্দায় সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে। আজকাল আবার ঘরের মেঝেতেও রোদ্দুর এসে পড়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে। সারাদিনই আলোতে আলোতে ঝলমল ঝলমল করে যেন সমস্ত পৃথিবী।

আর যখন রাত্তির আসে, আকাশ থেকে সরে যায় ঘন নীল পর্দাটা, আকাশ ভরা তারা ঝিকমিক ঝিকমিক করে ওঠে। যেন নরম কালো মখমলের ওপর ছড়ানো হীরের কুচি। অন্ধকারও এমন ফুটফুটে যে তার ভেতর দিয়ে এতটুকুন একটা আলোর ফোঁটার মতো সবচেয়ে দূরের তারাটাও বুঝি দেখা যায়।

এর মধ্যে আবার এক-এক দিন বাতাস দেয়। কখনও পুবের বাতাসের ঠেলা খেয়ে উড়ে আসে জলভরা কালো মেঘ। ঝমঝমিয়ে এক পশলা বৃষ্টির পরে আকাশ আবার আগের মতোই নীল। এক-আধ দিন হয়তো উত্তর থেকে আসে আলতো হাওয়া, তাতে একটু ঠাণ্ডা আমেজ, একটু বা শিউলি ফুলের গন্ধ. কখনও বা কোনও ভিনদেশী পথিক পাখির একটু কলকলানি। ব্যাপারটা কী হচ্ছে না হচ্ছে ভালো করে ঠাহর করার আগেই ফুরিয়ে যায়।

শুধু এটুকু ঠাহর হয়, আকাশে বাতাসে মাটিতে সব কিছুতেই কী একটা ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। আকাশ আর কালো মেঘে হাঁড়িপানা মুখ করে নেই, বাতাস আর ভারী স্যাঁতসেঁতে নেই, আলো আর মন-খারাপ-করানো ছায়াতে মলিন নয়। সে-সবের বদলে সবকিছুই কেমন নতুন-নতুন—নতুন জামাজুতো কি নতুন পুজো-বার্ষিকীর মতো হাসিখুশিতে ভরা তকতকে ঝরঝরে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে পুজোর দিন এসে গেল। তার মানে শরৎ ঋতু

* * *

শনিবার রাত্তির বারোটার পর যেমন টপ করে রবিবার এসে যায় ঠিক তেমনই করে নয়, আসি আসি করে খানিকটা এসে আবার ফিরে যায়, একটু ফিরে আবার আসে—এমনই করে একটা ঋতুর পরে আর একটা ঋতু আসে. আসব কি আসব না করতে করতে আসে, একদিনে নয়, দিনে দিনে।

আজ থেকে যদি রোজ ভোরে উঠে লক্ষ করো যে, সূর্য ঠিক কোনখান থেকে উঠছে তাহলে দেখবে, প্রত্যেক দিনই সূর্য একটু একটু করে ডান দিকে সরে গিয়ে উঠছে। তার মানে সূর্য এখন চলেছে দক্ষিণে। বছরে একবার সূর্যের পথ আস্তে আস্তে উত্তর দিকে সরতে থাকে, আর একবার সরতে থাকে দক্ষিণ দিকে। সূর্যের এই উত্তর-দক্ষিণে আসাযাওয়াকে বলে বার্ষিক

গতি।

সূর্যের বার্ষিক গতিকে মেনে চলে বাতাসের গতি। সূর্যের তাপে বাতাস যখন গরম হয় তখন হালকা হয়ে যায়, হালকা হয়ে তা উঠে যায় ওপরে। কিন্তু পৃথিবীর কোনও জায়গা স্বাভাবিক ভাবে বাতাস ছাড়া থাকতে পারে না। তাই যেখানকার বাতাস ঠাণ্ডা অর্থাৎ ভারী সেখানকার বাতাস ওপরে-উঠে-যাওয়া বাতাসের খালি জায়গাটা দখল করতে ছুটে আসে।

এভাবে পৃথিবীর বাতাস চাকার মতো সমানে ঘুরপাক খাচ্ছে—একবার গরমে হালকা হয়ে নিচে থেকে ওপরে উঠছে, আবার ঠাণ্ডা হয়ে নিচে নামছে আর একবার ঠাণ্ডা বাতাস উত্তর থেকে দক্ষিণে কি দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাচ্ছে খালি জায়গা ভরাট করার জন্যে।

বাতাস যখন নিচে থেকে ওপরে ওঠে, তখন আমরা বাতাসের গতি বুঝতে পারি না। বাতাসের এই নিচে থেকে ওপরে গতির অবস্থাটাকেই গুমোট বলি। একদিক থেকে যখন বাতাস আর-একদিকে চলে তখন গতিটাকে ভালো করে বুঝতে পারি, তাই সেই অবস্থাতে বলি বাতাস বইছে।

যেমন বার্ষিক গতি অনুসারে চলে বাতাসের গতি তেমনই বাতাসের গতি অনুসারে চলে ঋতুর গতি। আমাদের দেশে এই ঋতুর গতিটা কী রকম?

* * *

পৃথিবীটাকে উত্তরে দক্ষিণে সমান দুটো ভাগ করে ঠিক মাঝখানটাতে একটা রেখা কল্পনা করা হয়েছে—একে বলে নিরক্ষ রেখা। পৃথিবীর উত্তর ভাগে আমাদের দেশ। এর বুকের উপর দিয়ে গেছে কর্কট ক্রান্তি রেখা। এটা নিরক্ষ রেখার ঠিক সাড়ে তেইশ ডিগরি উত্তরে। সূর্য উত্তরে সরতে সরতে কর্কট ক্রান্তি রেখা পর্যন্ত আসে, তারপর আবার আস্তে আস্তে সরতে থাকে দক্ষিণে। চলে যায় সাড়ে তেইশ ডিগরি দক্ষিণে মকর ক্রান্তি রেখা পর্যন্ত।

সূর্য যখন কর্কটক্রান্তি রেখার ওপর কিংবা এই রেখার কাছাকাছি থাকে তখন আমাদের দেশে গরম কাল। সূর্যের তাপে তখন এখানকার বাতাস হালকা হয়ে ওপরে ওঠে আর দক্ষিণ থেকে ঠাণ্ডা ভারী বাতাস আসে খালি জায়গা দখল করতে। ওই বাতাস আসার সময় সমুদ্রের জলীয় বাষ্প বয়ে আনে আমাদের দেশের ওপর।

এই বাতাস বিশেষ একটা সময়ে বয় বলে এর নাম মৌসুমী বায়ু। এই বাতাস আমাদের দেশে এসে যখন হিমালয় পাহাড় আর পশ্চিমঘাট পাহাড়ে ধাক্কা খায় তখন বৃষ্টিপাত শুরু করে। উঁচুতে উঠে বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে যায়, সেইজন্যে আর জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে না। যে বাতাস যত ঠাণ্ডা তাতে জলীয় বাষ্প ধারণের ক্ষমতা তত কম।

ব্যস, শুরু হয়ে যায় বর্ষাকাল।

ওদিকে সূর্য যখন কর্কটক্রান্তি রেখা থেকে দক্ষিণে সরতে শুরু করে তখন সে তো সরতে সরতে ক্রমশ নিরক্ষ রেখা পেরিয়ে একেবারে মকর ক্রান্তি রেখা পর্যন্ত যাবেই। কর্কটক্রান্তি রেখা থেকে সূর্য যতই দক্ষিণে সরে যায় ততই আমাদের দেশে তার উত্তাপ কমে যায়। তখন আর এখানের বাতাস গরমে হালকা হয়ে ওপরে উঠে যায় না, আমাদের দেশের বায়ুমণ্ডলে আর কোনও জায়গা ফাঁকা হয়ে যায় না, সেই ফাঁক ভরাট করার জন্যে আর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাতাস ছুটে আসে না।

২১ শে জুন তারিখে উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন হয়। তারপর থেকে দিন ক্রমশ ছোট হতে থাকে। ক্রমে ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্য আবার বিষুব রেখার ওপর লম্বালম্বি ভাবে কিরণ দেয়। সেদিন পৃথিবীর সর্বত্র দিন রাত্রি সমান হয়। এই সময় দিনের বেলায় যতটা সূর্যের তাপ পৃথিবীর মাটিতে জমা হয়, রাত্তিরে তার প্রায় সবটাই বেরিয়ে যায়, সেই জন্যে বেশী গরম লাগে না, আবার রাত্তিরও দিনের চেয়ে বড় হয় না বলে বেশী ঠাণ্ডাও লাগে না।

এই সময়টাকেই বলি শরৎ ঋতু।

* * *

শরৎ কালেও এক এক সময় জলীয় বাষ্পে ভরা বাতাস দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে চলে আসে, আর এক এক সময় চলে আসে উত্তর-পূর্বের বাতাস। যেই দুরকম বাতাসে ধাক্কা লাগে অমনই বৃষ্টি। কিন্ত এক-আধ পশলা বৃষ্টি ঝরার পরেই জলের ভাগ প্রায় ফুরিয়ে যায়। তখন আবার সেই নীল আকাশ আর শাদা মেঘ।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, শরতের আকাশ কেন অত নীল আর মেঘ কেন অত সাদা। ধুলো আর ধোঁয়ার যেসব কণা সারাক্ষণ বাতাসে উড়ে বেড়াত, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সেসব কণা নেমে আসে মাটিতে, ভিজে ভারী হয়ে সেগুলো আর চট করে উড়তে পারে না। ফলে বায়ুমণ্ডল তখন অনেক বেশি পরিষ্কার থাকে। তাতেই আকাশটাকে অত নীল, দিনের রোদ্দুরকে আর রাত্তিরের অন্ধকারকে অত স্বচ্ছ দেখায়।

একই কারণে মেঘগুলোকেও দেখায় অত শাদা। আসলে বর্ষার সময় আমরা যে কালো মেঘ দেখি তাতে অনেক বড়ো মাপের ধোঁয়াধুলোর কণা থাকে, আর সেই কণাগুলোকে আঁকড়েই জলীয় বাষ্প মেঘ হয়ে উড়ে বেড়ায়। মেঘের মধ্যে ধোঁয়াধুলোর কণা যত মিহি হয়ে কিংবা যত কম হয়ে আসে ততই মেঘগুলোকে শাদা দেখায়। তার মানে ওই কণাগুলোর জন্যেই মেঘকে কালো দেখায়। কণাগুলোর ভার থাকে না বলে শাদা মেঘ ওড়ে আরও উঁচুতে। আর শরৎকালে বাতাস সাধারণত এক পাশ থেকে আর-এক পাশে বয় না, তাই মনে হয় যে, মেঘগুলো এক জায়গাতেই ঠায় ভাসছে।

তবে শরৎ কালে যেমন হঠাৎ হঠাৎ অল্পক্ষণের জন্যে বৃষ্টি হয়ে যায় তেমনই এক এক সময় উত্তরের বাতাসও বয়ে যায়। হিমালয় অঞ্চলে ওই বাতাস তো অপেক্ষা করেই আছে—কখন সূর্য সরে যাবে আরও দক্ষিণে, কখন ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের দেশের ওপর। যখনই দেখে, দক্ষিণের বাতাসের জোর কম তখনই উত্তরের বাতাস নেমে পড়ে, খুব জোরে নয়, আলতো করে বয়ে যায়, ঠাণ্ডার আমেজ ছুঁইয়ে।

এক এক সময় শরতেও প্রচণ্ড ঝড় ওঠে। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বাতাস আর উত্তর পূর্ব থেকে আসা ঠাণ্ডা বাতাসে জোর ধাক্কা লাগে। একেই বলা হয় আশ্বিনের ঝড়। এই ঝড় উঠলে শরতের আর শান্ত শিষ্ট ভাব বজায় থাকে না—গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায় এর প্রচণ্ডতায়।

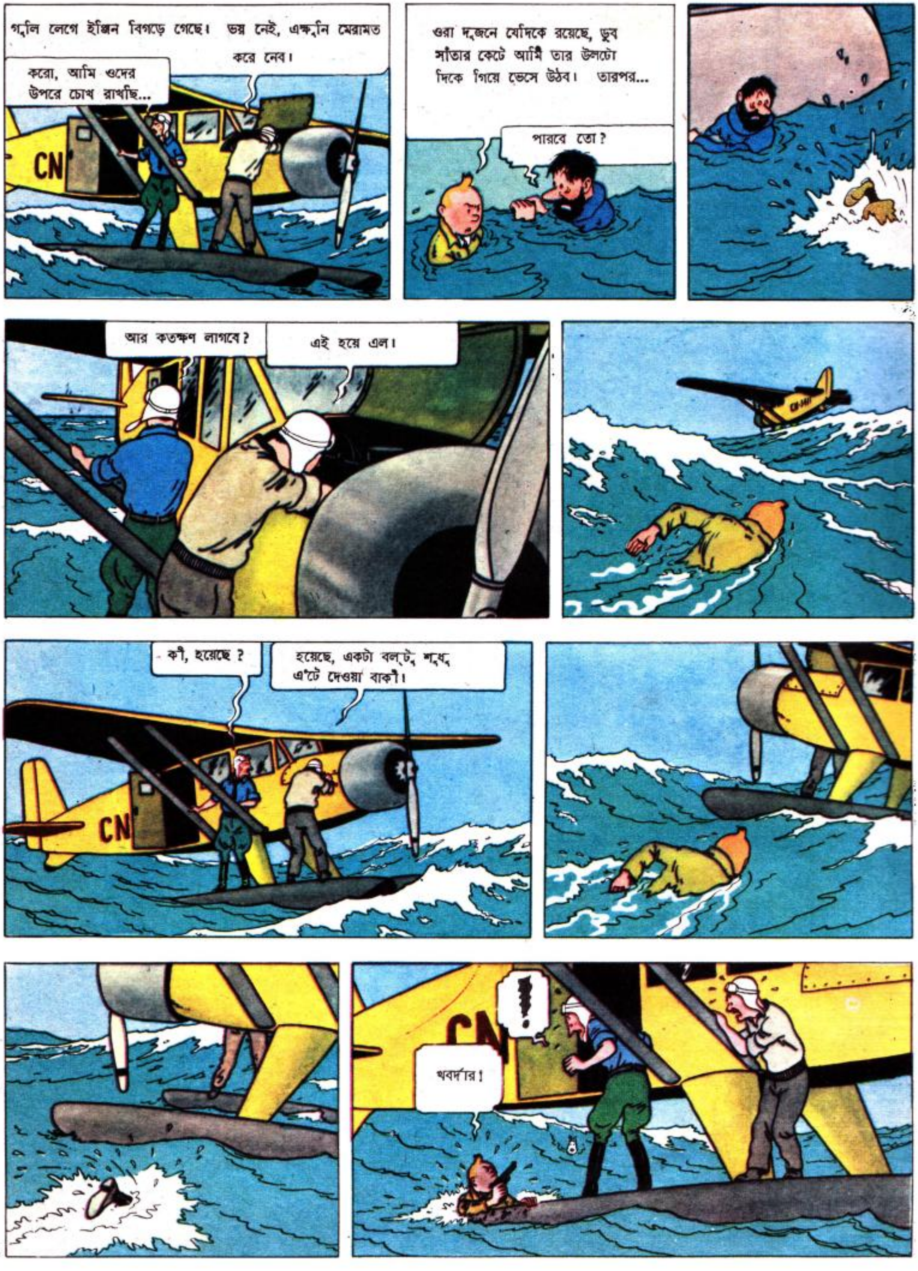
গুলি লেগে ইঞ্জিন বিগড়ে গেছে। ভয় নেই, এক্ষুনি মেরামত করে নেব।
করো, আমি ওদের উপরে চোখ রাখছি...
CN
ওরা দুজনে যেদিকে রয়েছে, ডুব সাঁতার কেটে আমি তার উলটো দিকে গিয়ে ভেসে উঠব। তারপর...
পারবে তো?
আর কতক্ষণ লাগবে?
এই হয়ে এল।
কী, হয়েছে?
হয়েছে, একটা বল্টু শুধু এঁটে দেওয়া বাকী।
CN
!
CN
খবর্দার!

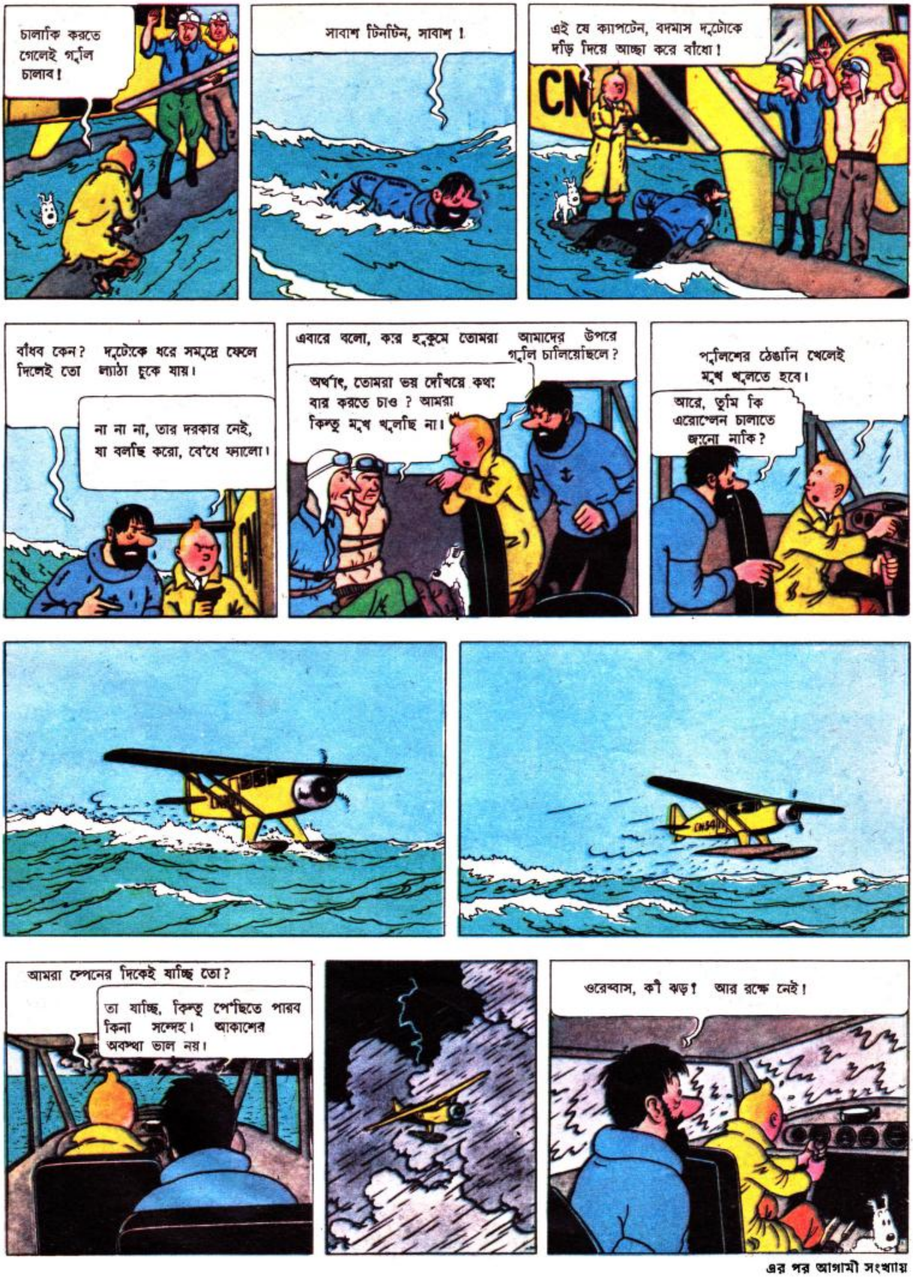
চালাকি করতে গেলেই গুলি চালাব!
সাবাশ টিনটিন, সাবাশ !
এই যে ক্যাপটেন, বদমাস দুটোকে দড়ি দিয়ে আচ্ছা করে বাঁধো !
CN
বাঁধব কেন? দুটোকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।
না না না, তার দরকার নেই, যা বলছি করো, বেঁধে ফ্যালো।
এবারে বলো, কার হুকুমে তোমরা আমাদের উপরে গুলি চালিয়েছিলে?
অর্থাৎ, তোমরা ভয় দেখিয়ে কথা বার করতে চাও ? আমরা কিন্তু মুখ খুলছি না।
পুলিশের ঠেঙানি খেলেই মুখ খুলতে হবে।
আরে, তুমি কি এরোপ্লেন চালাতে জানো নাকি?
আমরা স্পেনের দিকেই যাচ্ছি তো?
তা যাচ্ছি, কিন্তু পৌঁছতে পারব কিনা সন্দেহ। আকাশের অবস্থা ভাল নয়।
ওরেব্বাস, কী ঝড়! আর রক্ষে নেই!

এর পর আগামী সংখ্যায়

জরাসন্ধ

কুহু-কেকা সংবাদ

মণ্টুদা, মণ্টুদা, মণ্টুদা! একশোবার শুনে-শুনে কেকার কান দুটো ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু কী করবে? কুহু তার বন্ধু, একসঙ্গে পড়ে, এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় বাড়ি। তাই শুনতে হয়, কোথায় কাদের ঘাড়ে কটা গোল চাপিয়েছে মণ্টুদা, কতগুলো কাপ মেডাল আর শীল্ড বাগিয়েছে দৌড়ে, সাঁতারে কিংবা লাফিয়ে। বড় বড় চোখ করে ঘাড়ও নাড়তে হয় মাঝে মাঝে। বলতে হয়, "তাই নাকি!"

সেদিন ছিল রবিবার। সকাল-সকাল চায়ের পালা সেরে পড়ার ঘরের দোর বন্ধ করে কালরাতের শুরু করা ডিটেকটিভ গল্পটা সবে খুলে বসেছে কেকা, দরজার গায়ে ঠকঠক। আওয়াজ শুনেই বুঝল, কে। খুলতে হল। যা ভয় করছিল, তাই। কুহু হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকল। হাতে একটা খবরের কাগজ। "মণ্টুদার ছবি বেরিয়েছে। তোকে দেখাতে নিয়ে এলাম। কী সুন্দর উঠেছে, দ্যাখ।"

কেকা হাসি-হাসি মুখ করে দেখল। আসলে কিছুই ওঠেনি। কতগুলো ইউনিফর্ম-পরা ছেলে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। মণ্টুদা বলে যাকে দেখাল তাকে ভজাদা কেষ্টদা পটলদা বলেও অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যেত। কারো সঙ্গে কারো এতটুকু তফাত নেই। কুহু তখন ফলাও করে বলে চলেছে, "জানিস? মণ্টুদা এবার স্পোর্টিং ইউনিয়নের হয়ে সিনিয়র লীগে চান্স পাচ্ছে।"

নাঃ, এরপরে আর চুপ করে থাকা চলে না। একটু বেশীরকম বেড়ে গেছে কুহু। এতকাল শুধু একতরফা শুনে গেছে কেকা। এবার ওর মুখ খোলা দরকার। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, স্পোর্টিং ইউনিয়ন! ওটা আবার একটা টীম নাকি? আমার ঝণ্টুদা তো মোহনবাগানে খেলে।

"বলিস কী!" চোখ কপালে তুলল কুহু, "ভাল নামটা কী বল তো।"

কেকা সে-কথার জবাব দিল না। যেন শুনতেই পায়নি। গড়গড় করে বলে গেল ঝণ্টুদার খেলোয়াড়-জীবনের তাক-লাগানো ইতিহাস। শুধু কি ফুটবল নাকি? ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, সবগুলোতে ওস্তাদ। যাকে বলে, স্কোয়ার। সেবার ওর খেলা দেখে সোবার্স একেবারে থ'। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে নিয়ে যাবার জন্যে কী টানাটানি। বড় মাসিমা রাজী হলেন না। বাড়ির বড় ছেলে কিনা।

"অ্যাদ্দিন বলিসনি তো? কোন প্লেসে খেলেন মোহনবাগানে?"

"সব প্লেসে। ফরওয়ার্ড, হাফব্যাক, ব্যাক—যেখানে দাও।"

কুহু আর বসল না।

দিন কয়েক পরে স্কুল থেকে ফিরে কেকা দেখল, সারা বাড়িতে হৈ চৈ পড়ে গেছে। কী ব্যাপার? ঝণ্টুদা আসছে দু-তিন দিনের জন্যে। কত বছর হল ঝণ্টুদাকে দেখেনি কেকা। সেই যে সেবার গিয়েছিল মার সঙ্গে। সেই শেষ দেখা। তখন ও কতটুকু। ঝণ্টুদাও ওর চেয়ে মোটে তিন বছরের বড়। কিন্তু কী গম্ভীর। সারাদিন বই নিয়ে বসে আছে। দুর্দান্ত ভাল ছেলে। এবার হায়ার সেকেণ্ডারিতে ফোর্থ হয়েছে। ইতিহাসে অনার্স নেবে। সেই জন্যেই আসা। কেকাদের বাড়ি থেকে মুর্শিদাবাদ পাঁচ মাইল। হাজারদুয়ারী, সিরাজের কবর, আরো যে-সব পুরাকীর্তি আছে সেখানে, সে-সব দেখবে। তা না হলে বড়বাজারের বাঁড়ুজো-বাড়ির ছেলে কখনো কলকাতার বাইরে পা দেয়? ছুটিছাটায় অবিশ্যি উটি, ওয়ালটেয়ার, কাশ্মীর, আগ্রা ঘুরতে বেরোয়। তাই বলে এই অজ পাড়াগাঁয়ে আসবে কী করতে? কত বড় বনেদী বড়লোক ওরা। ওর জ্যাঠামশাই বলে রেখেছিলেন,

যেখানে খুশি যাও. শেয়ালদর স্টেশনে গাড়ি চড়ো না। তার পরেই বাঙালদেশ—জোঁক, মশা, কচুরিপানা আর ম্যালেরিয়ার রাজত্ব। ভাগ্যিস তিনি নেই। তা না হলে ঝন্টুদার কখখনো আসা হত না।

কিন্তু এদিকে যে গোলমেলে খবর। ফুটবল টুর্নামেন্ট চলছে বটতলার মাঠে। কুহুটার পেটে তো কথা থাকে না। চারদিকে রটে গেছে, ঝন্টুদা মোহনবাগানের প্লেয়ার। ছেলেগুলো নাচতে শুরু করেছে. ওদের টীমে অর্থাৎ মাধবডাঙা 'উত্তরপাড়া এফ সি'তে ঝন্টুদাকে নামাতে হবে। সেকেণ্ড রাউণ্ডে উঠেছে তারা। 'দক্ষিণপাড়া ইলেভেন'এর সঙ্গে খেলা। কুহুর বাবা ঐ ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট। মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন কেকার কাছে ঝন্টুকে যদি বলে কয়ে ঠেকানো যায়। মোহনবাগানের প্লেয়ার মাধবডাঙায় খেলবে কী! কেকাও তো তাই চায়। ঝোঁকের মাথায় কুহুকে সেদিন কী বলে ফেলেছিল! আসলে সে কী কে জানে? এদিকে আবার উত্তরপাড়ার ছেলেগুলো তার বাবাকে গিয়ে ধরেছে। তিনি তো ওদের চেয়েও এক কাঠি সরেস। "মোহনবাগানে খেলে নাকি! তাহলে তো নামাতেই হবে ঝন্টুকে।"

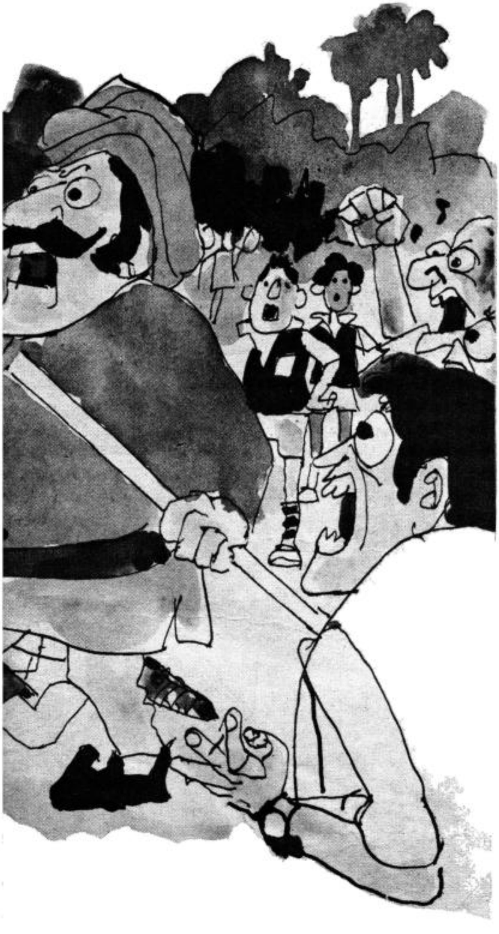

বেগতিক দেখে কেকা মেজকাকে গিয়ে ধরল। ওঁর কাছে সব আব্দার চলে। তাছাড়া উঁকিল মানুষ। একটা কোনো পথ বাতলে দিতে পারবেন, যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে।

সব কথাই খুলে বলল মেজকাকে। রবীনবাবু হাসলেন, "এসব বলতে গেলি কেন মেয়েটাকে?"

"বা-রে! ও বরাবর চাল মারবে, আর আমি কিছু বলবো না?"

"তা ঠিক। তবে পাল্টা চালটা বড্ড লম্বা হয়ে গেছে। সামলানো মুশকিল।"

কেকা আর কী বলে? মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। মেজকা ভরসা দিলেন, "আচ্ছা আসুক ঝন্টু। দেখি কী করা যায়।"

ঝন্টু এলে এ-কথা ও-কথার পর জানতে চাইলেন রবীনবাবু, "ফুটবল টুটবল খেল?"

কেকা পাশের ঘরে কান পেতে আছে। মনে হল ঝন্টুদা আঁতকে উঠল—"ফুটবল!"

"হ্যাঁ, এক-আধটু অভ্যেস আছে তো?"

"আজ্ঞে না, খেলার মাঠে কোনোদিন যাইনি।"

"বল কী! তোমাদের স্কুলে তো বেশ ভাল টীম আছে।"

"তা থাকতে পারে, তবে আমি ওর মধ্যে নেই। আমাদের বাড়ির ছেলেরা খেলে না। জ্যাঠা-মশাইয়ের স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার।"

"কেন বলতো?"

"উনি বলতেন, ফুটবল তো শুধু ফুট্ দিয়ে খেলে না, হেড্ও লাগাতে হয়। অতবড় একটা শক্ত জিনিসের ঘা খেয়ে খেয়ে মাথার ঘিলুগুলো জমাট বেঁধে যায়। বুদ্ধি খেলে না। তাইতো বড় বড় খেলোয়াড়গুলো বেশিরভাগই লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা।"

"কিন্তু জ্যাঠামশাই স্বর্গে যাবার পর মাঝে মাঝে এক-আধটু পরখ করে দ্যাখনি. জিনিসটা কীরকম?... বলনা? আমার কাছে বলতে আর দোষ কী?"

ঝন্টু স্বীকার করল, বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে কখনো সখনো দু-চারটা শট্ মেরেছে। রবীনবাবু বললেন, "ব্যস, তাহলেই হল। ছেলেরা যখন আসবে, ওদের 'না' বলে দিও না।"

"কিন্তু এই বিদ্যে নিয়ে ম্যাচ খেলতে নামা—"

"সে জন্যে তো আমি রইলাম। কেকা......"

মেজকার ডাক শুনে কেকা গিয়ে দাঁড়াল কাঠগড়ার আসামীর মত। রবীনবাবু বললেন, "কী বলছে তোর বন্ধুরা?"

"বলছে, তোর দাদা কি মেয়েমানুষ নাকি, ফুটবল খেলতে ভয় পায়?"

"না না, ভয় পাব কেন?" কেকার চোখের দিকে তাকাল ঝন্টু, "মানে অভ্যেস-টভ্যেস তেমন নেই। তা সবাই যখন বলছেন—।"

পরদিনই খেলা। রবীনবাবু উত্তরপাড়া এফ সি-র ক্যাপ্টেনকে বললেন. "অতবড় একটা প্লেয়ার, গেঁয়োটীমে খেলবে, এটাতো সত্যিই আশা করা যায় না। অনেক বলে কয়ে রাজী করিয়েছি। কিন্তু কদিন আগে ইস্ট বেঙ্গলের

সঙ্গে খেলতে গিয়ে পায়ে লেগেছে। ছুটতে পারবে না। গোলে খেলবে।"

"তাহলে তো খুব ভালো। আমাদের গোলকীপারটা কিছু নয়। ঐখানটায় ও'কে পেলে আর আমাদের আটকায় কে।"

অতবড় মাঠে একতিল জায়গা নেই। সাত-আটটা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছে। মোহনবাগানের প্লেয়ার চোখে দেখাই বরাতের কথা। আর এখানে তার খেলা দেখা যাবে! বহরমপুর থেকে হোমরাচোমরা দর্শকও এসে গেছেন কিছু।

ঝন্টু ঘরে বসেই সব খবর পাচ্ছে। মাঝে মাঝে ভাবছে. কেন মরতে এসেছিল মাসীর বাড়ি? ভীষণ রাগ হচ্ছে কেকার উপর। কী দরকার ছিল বন্ধুর কাছে চাল মারবার? আবার মায়াও হচ্ছে—আহা বেচারা! ও কি জানত এত সব কাণ্ড ঘটবে? একবার ভাবল, সরে পড়লে কেমন হয়?

দরজার গায়ে হাতের শব্দ. "আসতে পারি ঝন্টুদা ?"

"এসো।"

কেকা আস্তে আস্তে ঢুকল। কিছু বলল না। দুচোখভরা মিনতি।

রেফারী রবীনবাবু। মাঠে বেরোবার আগে ঝন্টুকে একা ডেকে নিলেন তাঁর ঘরে। চুপিচুপি কী সব বলে পিঠ চাপড়ে দিলেন, "উইস ইউ গুড্‌ লাক্‌।"

খেলা শুরু হবার মিনিট পনেরোর মধ্যেই 'দক্ষিণ-পাড়া ইলেভেন' একটা গোল খেয়ে গেল। তখন পর্যন্ত উত্তরপাড়া এফ-সির পেনালটি এরিয়া ছাড়িয়ে কোনো বলই আসেনি। গোল খেয়ে মরীয়া হয়ে উঠল দক্ষিণপাড়া। দর্শকরাও যেন হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠল। মাঠের চারধারে কোদাল দিয়ে লাইন কাটা আছে। সেটা পেরিয়ে ভিতরে এসে পড়ছে কিছু কিছু লোক। লাইন্‌স্‌ম্যানদের সাধ্য কী আটকায়? রেফারী এরকম একটা অবস্থা আগেই আশঙ্কা করেছিলেন। কুহুর বাবাকে বলে রেখেছিলেন তাঁর দারোয়ান মহাবল সিংকে দরকার হলে ভিড় ঠেকাবার কাজে লাগানো হবে। সে তার জমকালো গালপাট্টা. মোটা গোঁফ, বিশাল ভুঁড়ি আর ভাঁটার মত দুটো চোখ নিয়ে মোতায়েন ছিল। রবীনবাবু ডেকে চুপি চুপি কী বললেন। সঙ্গে সঙ্গে সে লাইন ক্লিয়ার করতে লেগে গেল।

হঠাৎ উত্তরপাড়ার গোলের কাছে ভীষণ গণ্ডগোল। কী ব্যাপার? মহাবল সিং গোলকীপারকে রামধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে মাঠের বাইরে। প্রায় সারা মাঠের লোক রা রা করে তেড়ে এল—"কাঁহে ধাক্কা মারা?"

"জরুর মারেগা। বাঁশিওয়ালা বাবুকা হুকুম—কোই লাইনকা ওপর ইয়া অন্দর নেই আয়েগা।"

"আরে. ও বাবু তো খেলতা হ্যায়।"

"কাঁহা খেলতা হ্যায়। হাম তো দেখা তব্‌সে লাইনকা উপর খাড়া হ্যায়।"

খেলা থামিয়ে ছুটে এলেন রেফারী। 'উত্তরপাড়া এফ-সি'র খেলোয়াড় আর তাদের পক্ষের লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরল—এর প্রতিকার চাই। ও পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়া হল। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট খোদ এসে এদের ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করলেন। এমন সময় কোথা থেকে গোটাকয়েক ঢিল এসে পড়ল ভিড়ের মধ্যে। মারামারি লাগে আর কী। বেগতিক দেখে লম্বা হুইসল বাজিয়ে দিলেন রেফারী। খেলা শেষ।

না, ঝন্টুর কিছু লাগেনি। রাত্রে সবাই যখন একসঙ্গে খেতে বসেছে, কেকা বলল, "দারোয়ান ব্যাটার বদমাইসি আছে। অত জোরে ধাক্কা দেয়?"

ঝন্টু উত্তর দিল. "মোটেই জোরে দেয়নি।"

"তাহলে পড়ে গেলেন কেমন করে?"

ঝন্টু হাসিমুখে মেজকার দিকে ফিরল। তিনি বললেন, "ভাগ্যিস পড়েছিল। তা না হলে মোহনবাগানের মান থাকত কোথায়? আর কুহুর কাছে কেকারই বা মুখ থাকত কেমন করে?"

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

ম্যাজিক

জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র

‘জলে’র ম্যাজিক

হংকং-এর লোকেদের একটা অদ্ভুত রীতি আছে, তারা খাবার-দাবারের পর কিছুতেই জল পরিবেশন করে না।

চীনে খাবার খেতে আমরা প্রত্যেকেই ভালবাসি। সুতরাং কাজ-কর্মের পর খাবার পেয়ে মনের আনন্দে আমরা আকণ্ঠ খেয়ে ফেললাম। আর তারপরই, বলা বাহুল্য, জলতেষ্টা পেল। কিন্তু টেবিলে কাঁচের গ্লাসও নেই, জলের জগও নেই। ম্যানেজার সাহেব পাশেই ছিলেন; বললাম, প্রত্যেকের তেষ্টা পেয়েছে, জল দিন।” ম্যানেজারও তেমনি। বিজ্ঞের মতো চোখ বুজে আমায় বললেন, আপনাদের যদি তেষ্টা পেয়ে থাকে তো কফি, চা কোকাকোলা বা অরেঞ্জ জুস খেতে পারেন। তারপর বললেন, “আপনি তো জাদুকর, এগুলোকে জল বানিয়ে খেয়ে ফেলুন না।” আমি বুঝলাম, ভদ্রলোক চালাক হবার চেষ্টা করছেন। বললাম, “হ্যাঁ, তাই তো করবো, আগে সবাইকে দিন, দেখবেন আমরা জল বানিয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে নিচ্ছি।” ম্যানেজার আবার দৌড়লেন আরও অনেক কোকাকোলা আর অরেঞ্জ জুস আনতে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠে পড়লাম, আর চট করে একটা কাজ সেরে নিয়েই আবার চেয়ারে এসে বসে পড়লাম। ম্যানেজার তখনও আসেনি। তাই জানতেও পারলেন না। যখন ফিরে এলেন, আমরা তখন তাঁর হাত থেকে বোতলগুলো নিয়ে গ্লাসে কোকাকোলা ঢালতে লাগলাম। আর তারপর দলের সবাই মিলে ঢকঢক করে সেগুলো খেতে লাগলাম। ম্যানেজার বললেন, “আপনি বললেন, কোকাকোলাকে জল বানিয়ে খাবেন, কৈ তা তো করলেন না।” আমি বললাম, “আরে! আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?” এগুলো তো আমরা জলই খাচ্ছি।” ম্যানেজার মুখ শুকনো করে বললেন, “আপনি ঠাট্টা করছেন!” আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, “আরে ঠাট্টা কী মশাই, খেয়ে দেখুন না, মুখে যেতেই জল হয়ে যাচ্ছে।” আমি এক বোতল কোকাকোলা আর একটা স্ট্র তাঁর হাতে দিয়ে খেতে বললাম। তিনি অবিশ্বাসের সঙ্গে খেলেন, আর তারপরই চক্ষু ছানাবড়া হবার পালা। চেঁচিয়ে উঠে বললেন, “আরে! এতো সত্যি সত্যি জল খাচ্ছি।”

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছো, এটা হতে পারে না, বাজে কথা। আসলে কিন্তু এটা ভীষণ সহজ ব্যাপার। এবং পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক। ম্যানেজার যখন প্রথমবার আমাদের কোকাকোলা দিয়ে গেলেন, তখন আমি খেয়াল করে দেখেছিলাম, সেগুলো মোটেই ঠান্ডা নয়, বেশ গরম।

আমি তখন সেই কোকাকোলার একটা বোতল আর দু/তিনটে স্ট্র একসাথে নিয়ে সোজা বাথরুমে চলে গিয়েছিলাম। বাথরুমে একটা ঠান্ডা জলের কল ছিল। প্রথমে করলাম কী, ওই বোতল থেকে আস্তে আস্তে অর্ধেকটা কোকাকোলা ফেলে দিলাম। আর তারপর সেই বোতলের ভেতর দু/তিনটে স্ট্র একসাথে ঢুকিয়ে জলের কল খুলে দিলাম। স্ট্র-এর ভেতর দিয়ে কলের ঠান্ডা জল আস্তে আস্তে বোতলের তলায় জমা হতে লাগলো। একাজটা তোমরা সরু পাইপ দিয়ে করতে পারো। কোকাকোলার সঙ্গে ঐ জল মিশে গেল না, কারণ, কোকাকোলা ছিল গরম আর কলের জলটা ছিল কনকনে ঠান্ডা। বিজ্ঞান বলে, জল ঠান্ডা হলে ভারী হয়ে যায়, আর গরম হলে অপেক্ষাকৃত হালকা হয়ে যায়। সেজন্য গরম কোকাকোলা বোতলের ওপর দিকে রইলো আর ঠান্ডা জল বোতলের তলার দিকে জমা রইলো। কাজটাকে খুব ধীরে ধীরে করতে হবে। জোরে হলে দুটোই মিশে যাবে। যাই হোক এভাবে কোকাকোলার বোতলটাতে ঠান্ডা জল ভরে আমি টেবিলে এসে চুপচাপ বসেছিলাম। ম্যানেজার এসবের কিছুই জানতেন না, তিনি স্ট্র দিয়ে কোকাকোলা খেতেই তলার ঠান্ডা জলটা খেতে শুরু করলেন; তিনি ভাবলেন, কোকাকোলা বোধহয় সত্যি সত্যি জল হয়ে যাচ্ছে।

বাড়িতে বন্ধুবান্ধব এলে তোমরা এটাকে দুধ আর কফির লিকার দিয়ে দেখাতে পারো। তলায় থাকবে ঠান্ডা কফি আর ওপরে গরম দুধ। অথবা উল্টোটা, যেভাবে তোমাদের ইচ্ছে।

ম্যাজিকের মতো

পার্থসারথি চক্রবর্তী

একটা কাঁচের পাত্রে ত্রিশ গ্লাস জল ঢেলে সেটা কানায় কানায় ভর্তি করা হল। কাঁচের পাত্রের উপরটা খোলা, আর তার নীচে একটা সরু নল আছে যেটা স্টপার দিয়ে খুশিমতো খোলা ও বন্ধ করা যায়। পাত্রের সরু নলের মুখে খুলে একটা গ্লাস ধর। মনে কর, এই গ্লাসটা ভর্তি হতে আধ মিনিট সময় লাগছে। যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে স্টপারের মুখ খোলা থাকলে কাঁচের পাত্রের জল খালি হতে কত সময় লাগবে? তুমি হয়ত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবে এক গ্লাস জল পড়তে যদি আধ মিনিট সময় লাগে তাহলে সমস্ত পাত্রটা খালি হতে নিশ্চয়ই পনেরো মিনিট লাগবে।

আচ্ছা, এবার স্টপার খুলে দিয়ে একটা ঘড়ি নিয়ে দেখ ওটা খালি হতে কতটা সময় লাগছে। তুমি অবাক হয়ে দেখবে সময় লেগেছে দ্বিগুণ অর্থাৎ আধ ঘণ্টা। এটা কী করে হল বলত?

খুব ভালো করে দেখলে তবে বুঝতে পারবে, যে-হারে জল পড়ে সেটা সব সময় এক থাকে না, ওটা বদলে যায়। প্রথম গ্লাস ভর্তি হয়ে যাবার পর দ্বিতীয় গ্লাসের জল ভর্তি হতে সময় আরও বেশী লাগবে। কারণ পাত্রের জল কমে গেলে জলের উচ্চতা এবং সেই সাথে চাপও কমে যায়। ফলে তৃতীয় গ্লাস ভর্তি হতে সময় আগের চাইতে আরও বেশী লাগে।

কোনও পাত্রের উপরের মুখ খোলা থাকলে তার তরল পদার্থ নীচ দিয়ে যে বেগে বেরোয় তা নির্ভর করে ঐ তরল পদার্থের উচ্চতার উপর। এটা অঙ্ক কষে প্রথম বের করেন গ্যালিলিওর প্রিয় ছাত্র টরিসেলি। তাঁর সূত্র থেকেই সর্বপ্রথম জানা যায়, যে-বেগে তরল পদার্থ নীচেয় পড়ে তা কোনসময়েই ঐ তরলের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে না। উচ্চতা সমান হলে ভারী পারদ ও হাল্কা অ্যালকোহল একই বেগে পড়বে। আর যদি অভিকর্ষ বদলে যায়, তাহলে কী হবে বলত? তখনও কি তারা একই বেগে পড়বে? না, তা হয় না। চাঁদের অভিকর্ষ পৃথিবীর একের ছয় অংশের সমান। তাই চাঁদে একগ্লাস জল ভর্তি হতে লাগবে পৃথিবীর চেয়ে আড়াইগুণ বেশী সময়।

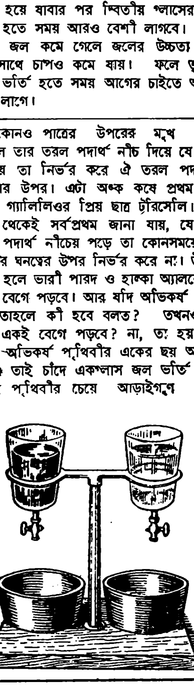

রাজা হওয়ার

আগে যা ঘটেছে

বোম্বাগড়ের মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ বানপ্রস্থে যাবেন। যাবার আগে দুই ছেলে কীর্তিনারায়ণ আর কান্তিনারায়ণের মধ্যে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি আধাআধি ভাগ করে দিয়ে যেতে চান। মরকত-মণিটিকে কেটে দু-ভাগ করা যায় না; তাই সেটিকে দেবেন এমন লোককে, যে সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধ। আর শ্রেষ্ঠ নির্বোধকে যে খুঁজে বার করতে পারবে, সেই রাজপুত্রই বসবে সিংহাসনে। রাজা বানপ্রস্থে গেলেন, মন্ত্রীমশাই শূন্য-সিংহাসনে রাজমুকুট বসিয়ে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন, আর দুই রাজপুত্র বার হলেন নির্বোধ খুঁজতে। ছ মাসের মধ্যে বোকা খুঁজে বার করা চাই। কিন্তু সারা রাজ্য ঢুঁড়েও তেমন বোকা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বনবাসী মহারাজার কাছে লোক পাঠানো হল। তিনি বললেন, বোম্বাগড়ে যদি বোকা খুঁজে না-ই পাওয়া যায়, তবে রাজপুত্রেরা বরং জম্বুদ্বীপে যাক তা দুই রাজপুত্র সেই অনুযায়ী দুই জাহাজে করে জম্বুদ্বীপে গেলেন। ছোট রাজপুত্র কান্তিনারায়ণ ও তার ভৃত্য মধু সেখানে এক কলাওয়ালার দেখা পায়। বিনা-পয়সায় সে তার কলার কাঁদি বিলিয়ে দিতে চাইছে দেখে কান্তিনারায়ণ ভাবে, লোকটা ভারী বোকা। কিন্তু কলা নিয়ে তারা দু-চার পা এগোবার পরেই কলাওয়ালা কোতোয়ালকে বলে যে, তারা অর কলার কাঁদি চুরি করে পালাচ্ছে। বাস, কোতোয়ালও অমনি তাদের কয়েদখানায় পুরে দিল। তারপর—

॥ ছয় ॥

ওদিকে কান্তিনারায়ণের বড় ভাই কীর্তিনারায়ণ জম্বুদ্বীপের আর এক প্রান্তের আর এক ঘাটে এসে নামলো। সঙ্গে তার সেবায়েত দাশরথি। দাশরথি সঙ্গে এসেছে বড়-রাজকুমারকে দেখা শোনা করবার জন্যে। দাশরথি যতদিন জাহাজে ছিল ততদিন রোজ ঘুম থেকে উঠেই মা বিশালাক্ষীর পুজো করতে বসতো। বলতো—হে মা, আমার বড়দাদাবাবু যেন রাজা হয়, আমার বড়দাদাবাবু যেন সব সেরা বোকাকে খুঁজে পায় মা—

দাশরথির বয়েস হয়ে গিয়েছিল। ছোটবেলা থেকে বড়দাদাবাবুকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। সোনার ঝিনুকে করে বড়দাদাবাবুকে দুধ খাইয়েছে। নিজে ঘোড়া সেজে বড়দাদাবাবুকে পিঠে চড়িয়ে ঘোড়া-ঘোড়া খেলা খেলেছে। দাশরথি ধরেই নিয়েছিল যে বড়দাদাবাবু রাজা হবে আর বড়দাদাবাবু রাজা হলে তখন দাশরথিরই সুবিধে হবে!

কিন্তু রাজামশাই যে কী বিধান দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেল। কোথায় পড়ে রইল বোম্বাগড়, আর কোথায় এই বিদেশ-বিভুঁই জম্বুদ্বীপ! এদেশে কেউ দাশরথিকে খাতিরই করে না। উল্টে দাশরথিই সকলকে খাতির করে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই কীর্তিনারায়ণ ডাকে —দাশরথি—ও দাশরথি—

দশবার ডাকাডাকির পর দাশরথি তবে এসে হাজির হয়। বড়দাদাবাবু জিজ্ঞেস করে—এতক্ষণ কী করছিলে তুমি, কথা তোমার কানে যায় না? বলো, কী করছিলে এতক্ষণ?

দাশরথি আম্‌তা আম্‌তা করে বলে—আজ্ঞে, আমি পুজো করছিলাম—

—পুজো? তোমার আবার অনেক রকম ভড়ং আছে দেখছি। কীসের পুজো করছিলে?

—আজ্ঞে, মা-বিশালাক্ষীর পুজো করছিলাম।

—কেন, সময় নেই অসময় নেই, কেন এত পুজো করো?

দাশরথি বলে—তোমার জন্যে বড়দাদাবাবু। পুজো করি যাতে তুমি রাজা হও—

কীর্তিনারায়ণ বলে—ওতে ঠাকুর খুশী হয় না দাশরথি, ওতে মা-বিশালাক্ষী খুশী হয় না। পুজো দুরকম, তা জানো দাশরথি? এক রকমের পুজো হলো বুদ্ধিমানের পুজো, আর একরকম হলো ভক্তিমানের পুজো। বুদ্ধিমানের পুজো হলো মোটা সুদে টাকা খাটানোর মত। লাভ-লোকসান খতিয়ে তবে পুজো দেয় বুদ্ধিমানরা, তার পুজো ঠাকুর নেয় না—

দাশরথি বলে—আমি অত-শত বুঝি নে বড়দাদাবাবু, যা করলে তোমার ভালো হয় আমি তাই-ই করি।

কীর্তিনারায়ণ বললে—কারো ভালো চাইলেই তার ভালো করা যায় না দাশরথি এইটে জেনে রাখো। কারো ভালো করতে গেলে নিজের কিছু ত্যাগ করতে হয়। নিজের ষোল-আনা বজায় রেখে নিজেরও ভালো করা যায় না, পরেরও না।

দাশরথি বললে—আমি অত লেখা-পড়া জানি নে বাপু, আমায় কী করতে হবে তুমি শুধু বলে দাও—

কীর্তি বললে—তা আমি বলে দেব তবে তুমি করবে? এই বিদেশে এসেছি, কত কী কাজ করবার রয়েছে। আর তুমি বসে বসে খাচ্ছো ঘুমোচ্ছ আর পুজো করছো। একটু রাস্তায় বেরোও। রাস্তায় বাজারে ঘাটে লোকের সঙ্গে মেশো। মিশে দেখ কোথাও বোকা লোক খুঁজে পাও কি না। লোকের সঙ্গে না মেলা-মেশা করলে বোকা লোক খুঁজে পাবে কী করে?

দাশরথি বললে—আচ্ছা তাই-ই যাই, রাস্তায় গিয়ে দেখি তো—

বলে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

জম্বুদ্বীপের রাস্তায়-রাস্তায় অনেক লোকের আনাগোনা। তাদের নানান রকম চেহারা, নানান রকম পোষাক। কারো মাথায় টুপি, কারো মাথা ন্যাড়া। কারো পরনে ধুতি, আবার কারো পরনে লুঙ্গি। আবার কেউ বা খালি পায়ে হাঁটছে, কারো পায়ে আবার খড়ম। জম্বু-

ঝকমারি

বিমল মিত্র

উপন্যাস

দ্বীপে এত রকম জাত, এত রকমের ধর্ম, এত রকমের পেশা—এ-রকম আগে কখনও বোম্বাগড়ে দেখেনি দাশরথি। সে অবাক হয়ে চারদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে চলতে লাগলো। চলতে চলতে যখন তার পা দুটো ব্যথা করতে লাগলো তখন একটা দোকানে গিয়ে বসে পড়লো। মাটির হাঁড়ি-কলসী-ঘটির দোকান সেটা। দোকানে তখন কোনও খরিদ্দার ছিল না।

দোকানদার দাশরথিকে দেখে বললে—কী নেবে হে তুমি? হাঁড়ি না কলসী? আমার কাছে সবরকম জিনিস আছে, ভালো-ভালো জিনিস—

দাশরথি বললে—আমি কিছু কিনতে আসিনি ভাই, আমি তোমাদের দেশে নতুন এসেছি, হাঁটতে হাঁটতে হয়রান হয়ে গিয়েছি। তাই একটু জিরিয়ে নিচ্ছি, এই পিঁড়ের ওপরে একটু বসি—

—কোন দেশ থেকে আসছো তুমি?

—বোম্বাগড়!

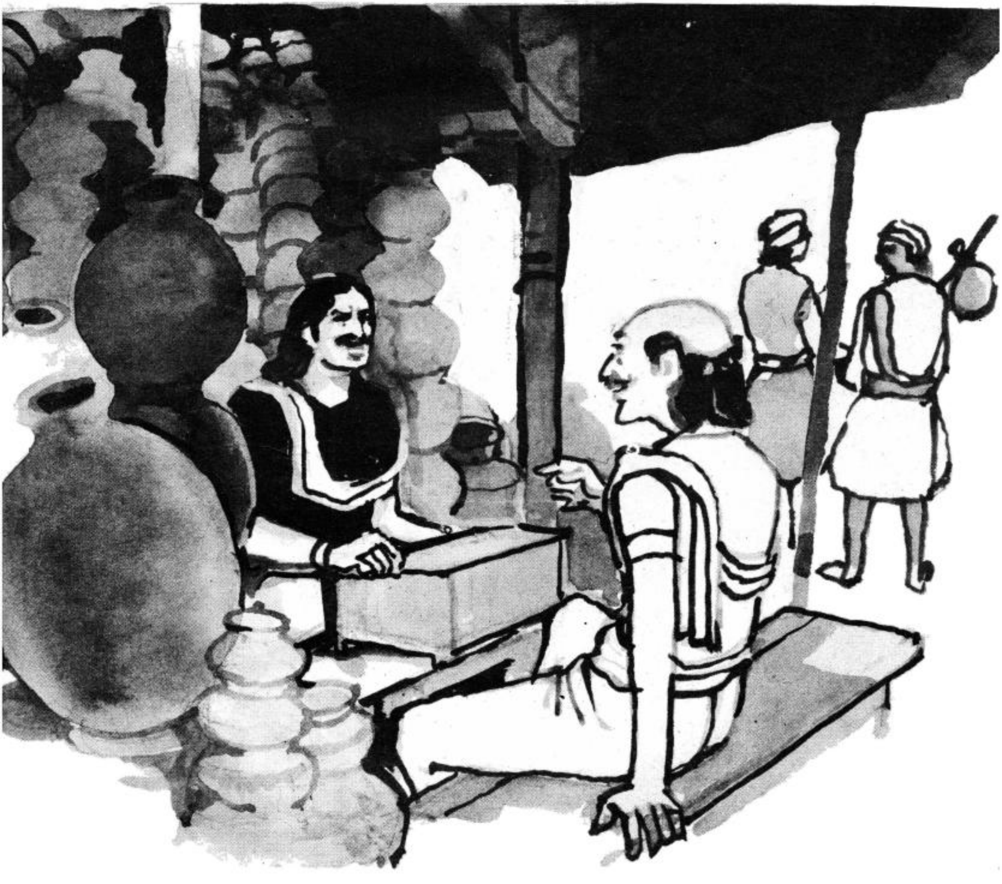

দোকানী নামটা শুনে চিনতে পারলে না। বোম্বাগড়! ভূগোলের কোন্ ভাগে যে বোম্বাগড়ের অবস্থান তা আন্দাজ করতেও পারলে না দোকানী। শুধু জিজ্ঞেস করলে—তা এদেশে কী করতে এসেছো? কারবারের ধান্ধায়?

দাশরথি বললে—না ভাই, কারবারের ধান্ধায় নয়। এসেছি মহা এক মুশকিলে পড়ে—

—মুশকিল? কী মুশকিল?

দাশরথি বললে—আমি বোম্বাগড়ের বড়-রাজকুমারকে নিয়ে তোমাদের দেশে এসেছি বোকা লোক খুঁজতে—

—বোকা লোক খুঁজতে? তার মানে?

দাশরথি তখন সমস্ত ইতিহাসটা স্পষ্ট করে খুলে বললে। কেমন করে বোম্বাগড়ের মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ এই নির্দেশ দিয়ে বানপ্রস্থে গেছেন, তারপর দুই রাজকুমার কেমন করে সারা বোম্বাগড় খুঁজেও একজন বোকা লোক পায়নি, আর বোকা লোক কেন খুঁজে বেড়াচ্ছে, সেরা বোকাকে খুঁজে বার করতে পারলে তাকে লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা দামের মরকত মণিটা কেন দেওয়া হবে, সে-সমস্ত কাহিনীটা গড়-গড় করে বলে গেল।

দোকানদার সমস্তটা মন দিয়ে শুনলো। তারপর খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলে। বললে—এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে তোমরা এত ভাবছো? এ তো খুব সোজা জিনিস—

দাশরথি যেন আশার আলো দেখতে পেলে। বললে—তোমার খোঁজে সত্যিই বোকা লোক আছে নাকি? সত্যিই আছে? তাহলে তো আমার বড়দাদাবাবু বেঁচে যায়। কিন্তু সে সেরা বোকা লোক হবে তো?

দোকানদার বললে—আরে, তোমরা এতদিন এখানে এসে উঠেছ আর এ-খবরটা আমাকে একদিনও জানাও নি?

দাশরথি বললে—তা এখন বলো না কোথায় গেলে সেই বোকা লোকটাকে পাবো? তার ঠিকানাটা আমাকে দাও না, আমি নিজে গিয়ে তাকে খুঁজে বার করবো—

দোকানদারটা এবার হাসতে লাগলো দাঁত বার করে। বললে—আরে তুমি নিজেই তো দেখছি একটা আস্ত বোকা। তোমার সামনে এত বড় একটা জলজ্যান্ত বোকা দাঁড়িয়ে আছে আর তুমি কিনা তাকে চিনতেও পারছো না?

দাশরথি অবাক হয়ে দোকানদারের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখতে লাগলো।

দোকানদার তেমনি করেই দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললে—হাঁ করে দেখছো কী? আমিই তো একজন বোকা—

দাশরথি অবাক হয়ে বলে উঠলো—তুমি? তুমি নিজেই বোকা?

দোকানদার বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই বোকা লোক। একেবারে মূর্তিমান বোকা, বোকার শিরোমণি—

দাশরথি তখনও হাঁ করে চেয়ে আছে দোকানদারের মুখের দিকে।

জিজ্ঞেস করলে—তোমার নাম কী? তোমার ঠিকানা কী? আমি তাহলে আমার বড়দাদাবাবুকে গিয়ে বলবো!

দোকানদার বললে—আমার নাম বিনোদ দাস। আর আমার এই ঠিকানা। তুমি তোমার বড়-রাজকুমারকে গিয়ে তাই বলো—আর যদি তেমন তাড়াহুড়ো থাকে তো আমি এখনই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে একবার তোমার মনিবের কাছেও যেতে পারি—

দাশরথি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যেন বাঁচলো। এতদিন ধরে বোকা মানুষ খুঁজে খুঁজে বড় দাদাবাবু হয়রান হয়ে যাচ্ছিল, এখন খবরটা শুনে একটু শান্তি পাবে মনে। যাক, বাঁচা গেল। দাশরথি বাঁচলো, বড়-দাদাবাবুও বাঁচলো। আর বিদেশে-বিভূঁই-এ বোকা খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে হবে না কাউকে। এখন শুধু একটা সমস্যা। ছোটবাবুর বাছাই করা বোকা আর বড়-দাদাবাবুর বাছাই করা বোকা—এই দুজনের মধ্যে যে সেরা বোকা বলে বাছাই হবে সে-ই পাবে মরকতমণিটা!

দাশরথি বললে—আচ্ছা তুমি এখানে একটু থেকো ভাই, আমি বড়দাদাবাবুকে এখ্খুনি এখানে ডেকে নিয়ে আসছি—চলে যেও না যেন—

বলে উর্ধ্বশ্বাসে পড়ি-কি-মরি করে দাশরথি বাসার দিকে ছুটতে লাগলো।

কদিন থেকে বড়-রাজকুমার কীর্তিনারায়ণ বড় দুর্ভাবনায় পড়েছিল। ভাগ্যের এ কী পরিহাস তার! কোথায় বাবা বানপ্রস্থে যাবার পর সোজা সিংহাসনে গিয়ে সে উঠে বসবে, তা নয়, এ কী ঝামেলা তার কপালে! মহারাজার বড় ছেলেই বরাবর রাজা হয়—এই-ই তো সাধারণ নিয়ম! হঠাৎ তার বেলাতেই বা এমন বেয়াড়া শর্ত দেওয়া হলো কেন?

একে নতুন দেশ, নতুন জল-হাওয়া, তার ওপর কারো সঙ্গে জানা-শোনা নেই, কথা বলবার একটা লোকও হাতের কাছে পাওয়া যায় না যে দুটো কথা-বার্তা বলে সময় কাটাবে! আর এমন করে কি বোকা লোক খুঁজে বার করা যায়? দুনিয়াতে কেউ কি কখনও নিজেকে বোকা বলে জাহির করে? হীরে-মুক্তো-সোনা-রূপোর বদলেও কেউ কখনও নিজেকে বোকা বলতে রাজি হয় না। এটাই মানুষের নিয়ম। আর তা-ই যদি হয় তো তাহলে বোকা খুঁজে পাওয়া যাবে কী করে?

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কীর্তিনারায়ণের মাথা গরম হয়ে উঠতো। তখন আর কিছু ভালো লাগতো না তার। তখন মনে হতো দরকার নেই রাজা হয়ে। রাজা হওয়ার অনেক ঝক্মারি। তার চেয়ে প্রজা হওয়ায় অনেক শান্তি। তাদের কোনও ঝক্কি-ঝামেলা নেই। কেবল চাষ-বাষ করো, মাছ ধরো, তাস খেলো আর নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও। তখন আর কেউ তোমাকে হিংসে করবে না, কেউ আর তোমাকে ছোট করতে চেষ্টা করবে না। কিন্তু তাহলে রাজা হতে কেন সে চাইছে? ছোটবেলা থেকে কেন রাজা হবার জন্যে তার অত লোভ ছিল?

তা লোভ হবে না? রাজা হলে কত আরাম। রাজা হলে কত মজা। রাজা হয়ে সিংহাসনে বসলে সব লোক কত খাতির করবে, কত সেলাম করবে। যখন রথে চড়ে সে রাস্তা দিয়ে যাবে তখন লোক তাকে দেখে মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে নমস্কার করবে! এটা কি কম লোভ? সেই ক্ষমতা পাবার জন্যেই তো রাজা হওয়ার লোভ। নইলে আর কীসের জন্যে?

কিন্তু মাঝখান থেকে কান্তিনারায়ণ ভাই হয়ে জন্মে তার সব সাধে বাদ সাধলে। সে যদি বাবার এক ছেলে হতো তাহলে আর তাকে এই দুর্ভোগ ভুগতে হতো না। সব ক্ষমতা সে সহজভাবেই ভোগ করতে পারতো।

হঠাৎ হাঁফাতে হাঁফাতে দাশরথি ঘরে এসে হাজির। বোধহয় অনেক দূরে থেকে দৌড়তে দৌড়তে এসেছে।

এসেই বললে—বড়-দাদাবাবু, বোকা পাওয়া গেছে একটা—

কীর্তিনারায়ণ বললে—কোথায় পেলে?

দাশরথি বললে—সেই কথা বলতেই তো দৌড়তে দৌড়তে আসছি।

কীর্তিনারায়ণ বললে—বোকাটাকে সঙ্গে করে এনেছ?

দাশরথি বললে—না, আনিনি। এ একেবারে খাঁটি বোকা। সে নিজের মুখে স্বীকার করেছে যে সে বোকা।

কীর্তিনারায়ণ অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—সে নিজেই স্বীকার করেছে?

—তা লোকটাকে কোথায় পেলে?

দাশরথি বললে—মা বিশালাক্ষী জুটিয়ে দিয়েছে। লোকটা একটা মাটির হাঁড়ির দোকানের মালিক। আমি তাকে সব খুলে বলেছি। তাতে সে বললে যে সে নিজেই বোকা। সে বলেছে সকলের মুখের ওপর সে বলবে সে বোকা—রাজসভায় দাঁড়িয়ে সে সে-কথা বলবে—

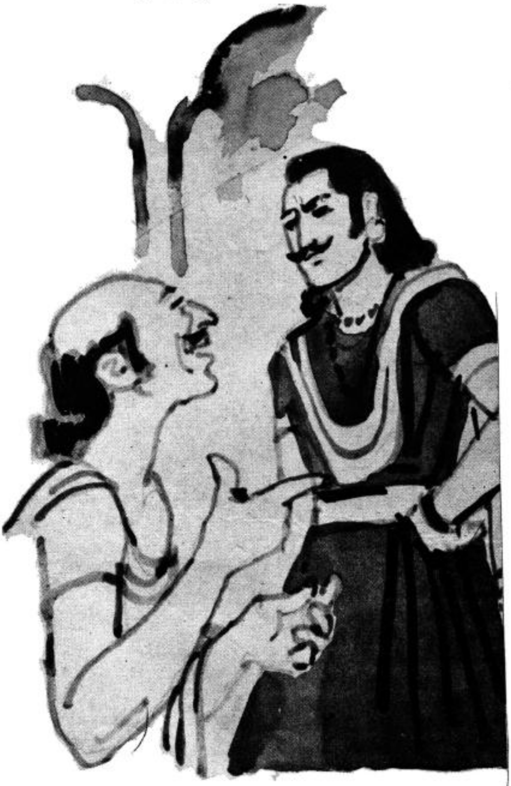

কীর্তিনারায়ণ জিজ্ঞেস করলে—কী করে জানলে সে সত্যিই বোকা?

দাশরথি বললে—লোকটা যখন নিজের মুখে বলেছে যে সে বোকা তখন আর তার প্রমাণ কী দরকার?

কীর্তিনারায়ণ বললে—তুমি বুঝবে না দাশরথি, তারও প্রমাণ দরকার। আমি যদি নিজে বলি যে আমি সাধু সৎ তাহলে কি লোকে তা বিশ্বাস করবে? আমাকে তো তার প্রমাণ দিতে হবে!

দাশরথি বললে—তার চেয়ে তুমি একবার নিজেই চলো না সেখানে বড়দাদাবাবু। আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আমি কী বুঝি? তুমি নিজের চোখে দেখলে, নিজের মুখে তার সঙ্গে কথা বললে বোকা কিনা তা বুঝতে পারবে। চলো না। আমি তাকে বলে এসেছি। সে আমাদের জন্যে তার দোকান খুলে রেখে দেবে। আমি তাকে বলেছি আমি এখনই তোমাকে নিয়ে তার কাছে যাচ্ছি—

কীর্তিনারায়ণের তবু যেন কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না। এতদিন ধরে তো অনেকরকম লোকই দেখলে সে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত কেউই তো নিজেকে বোকা বলতে চায়নি! হঠাৎ এ-লোকটাই বা নিজেকে এমন নির্বোধ বলতে রাজি হলো কেন? কী মতলব থাকতে পারে লোকটার?

জিজ্ঞেস করলে—লোকটার হাঁড়ির দোকান চলে কেমন? খদ্দের-টদ্দের আছে দেখলে?

দাশরথি বললে—আমি যখন ছিলাম তখন খদ্দের তেমন ছিল না। কিন্তু লোকটা ভারি ভদ্দরলোক।

কীর্তিনারায়ণ জিজ্ঞেস করলে—কীসে বুঝলে তুমি যে সে ভদ্রলোক?

দাশরথি বললে—ফরসা কাপড়, ফরসা চাদর গায়ে, গায়ের রংটাও ফরসা—

কীর্তিনারায়ণ বললে—তুমি তো দেখছি নিজেই একজন মহা-বোকা দাশরথি।

—কেন বড়দাদাবাবু? আমি কীসে বোকা হলুম?

কীর্তিনারায়ণ বললে—ফরসা কাপড় ফরসা চাদর আর গায়ের ফরসা রং দেখে কি বোঝা যায় কে ভদ্রলোক আর কে ছোটলোক। ভদ্রতা-অভদ্রতা তো কারো গায়ে লেখা থাকে না দাশরথি। কে ভদ্র আর কে অভদ্র তার বিচার হয় তার ব্যবহারে। মানুষের বাইরের চেহারা দেখে যে মানুষকে বিচার করে পৃথিবীতে সে-ই হলো সব চেয়ে বোকা। দেখছি মরকত-মণিটা শেষ পর্যন্ত তোমার কপালেই ঝুলছে—

দাশরথি বললে—অত কথায় কাজ কী বড়দাদাবাবু, তুমি একবার নিজেই চলো না সেখানে। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। তার সঙ্গে কথা বললেই তুমি বুঝতে পারবে লোকটা বোকা না চালাক—চলো-না—

কীর্তিনারায়ণ অগত্যা উঠলো।

বললো—চলো যাই। তুমি যখন অত করে বলছো তখন দেখেই আসি লোকটাকে—

(ক্রমশ)

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

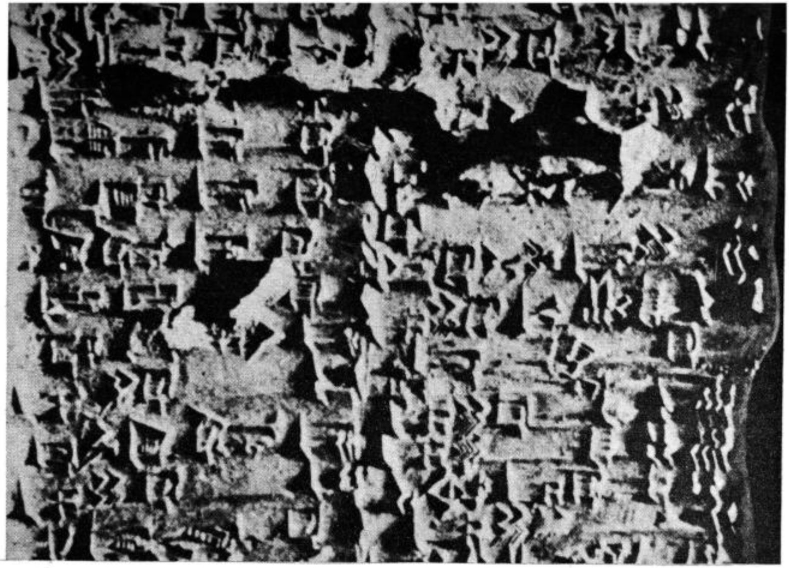

জাদুঘর

যদি বলি এটা একটা বইয়ের ছেঁড়া পাতা, তাহলে হয়তো চমকে উঠবে তোমরা।—যাঃ, তাও কি কখনও হয়? মোটা ওজনদার বইকে কখনও কখনও 'থান ইঁট' বলা হয় বটে, তাই বলে একখানা পাতাই ইঁটের মতো,—এ তবে কেমনতর বই? মজা সেখানেই। ঠিক ইঁট নয়, টালির মতো পাতা। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম পুঁথির নমুনা। বলতে পারো—দুনিয়ার সবচেয়ে পুরানো বই।

এই ছেঁড়া পাতাখানার বয়স কত জানো? প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর। পাওয়া গেছে ইরাকে। টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর ধারে, একদিন যেখানে প্রাচীন অ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলন,—ইতিহাসের সুমেরীয় সভ্যতা। মাটির টুকরোয় লেখা হতো আমাদের দেশেও। মহেঞ্জ-দরোয় পাওয়া গেছে তার নমুনা। সঙ্গে ছবিও রয়েছে। কিন্তু সেগুলো পুঁথির পাতা, না অন্য কিছু, কেউ এখনও তা সঠিক বলতে পারছেন না। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলছেন, ইরাকে পাওয়া এসব টালি, সন্দেহ নেই, পুঁথি। টালিগুলোকেও ওঁরা ঘরে পর পর সাজিয়ে রাখতেন। যেন—লাইব্রেরি। তবে এ পুঁথিকে নিয়ে পড়ুয়ার অসুবিধাও ছিল কম নয়। শুয়ে শুয়ে পড়া শক্ত। রেগে গিয়ে ছুঁড়ে মারলে বই নিমেষে খান খান। কারও মাথায় বা বুকে পড়লে বেচারা কুপোকাত।

আজকাল বই বলতে আমরা বুঝি ছাপা-বই। কাগজে ছাপা। কিন্তু সেকালে ছিল অন্য রকম। ব্যাবিলনে যদি মাটির-বই, মিশরে তবে প্যাপিরাস-এ লেখা পুঁথি। প্যাপিরাস এক ধরনের নলখাগড়া। সে-কেতাব কিন্তু গুটিয়ে রাখতে হতো, স্কুলে যেমন দেওয়াল-মানচিত্র গুটিয়ে রাখা হয়, সেই স্টাইলে। আমাদের দেশে ছিল ভূর্জপত্র, তালপাতার চল। কলকাতার অনেক লাইব্রেরিতে এখনও রয়েছে আদ্যিকালের সে-সব পুঁথির নমুনা। প্রাচীন গ্রীস আর রোমে লেখালেখি চলত হাতির দাঁতে, ধাতুর পাতে, নয়তো মোম মাখানো কাঠের পাটায়। ধাতুর পাতে লেখার রেওয়াজ ছিল আমাদের দেশেও। তবে সেসব বই নয়, হয়তো কোনও রাজাবাহাদুরের কোনও ঘোষণা। গ্রীকরা আবার এক সময় লিখতে শুরু করে চামড়ার ওপর। রোমানরা কাঠের তক্তায় লিখতো যে ধারালো কলম দিয়ে, তার নাম—স্টিলেটো। জুলিয়াস সিজারকে যখন খুন করা হয়, খুনীকে তা-ই দিয়ে আঘাত করেছিলেন তিনি। তাই থেকে 'স্টাইলো' একটি কলমের নাম।

কাগজের জন্মভূমি চীন। যিশুর জন্মের অন্তত দুশ বছর আগে নাকি কাগজ তৈরী করেছিল চীনারা। তার আগে ওদের লেখালেখি চলতো বাঁশে, কাঠে, কিংবা সিল্কে। প্রথম ছাপাখানাও ওদেশেই। কিংবা কোরিয়ায়। তার শত শত বছর পরে ইউরোপে। ইউরোপে প্রথম বই ছাপা হয় জার্মানিতে, ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। আমাদের দেশে তার প্রায় একশ' বছর পরে,—১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে। কোথায় জানো?—গোয়ায়। কলকাতায় ছাপার কাজ শুরু হয় আরও অনেক পরে। অথচ পুঁথি-লেখালেখি চলছে এদেশে সেই কবে থেকে!

কথায় কথায় কোথায় এসে পড়লাম। সেই মাটির-পুঁথির কথায় ফিরে যাওয়া যাক এবার। কী কথা লেখা এই পাতাটিতে? এই অক্ষর যাঁরা পড়তে পারেন, তাঁরা বলছেন, লেখা আছে—ফসল থেকে সে বছর কেমন খাজনা আদায় হলো তারই খবরাখবর। কোন্ বছর? তা সে যিশুর জন্মের অন্তত দুহাজার আটশ বছর আগে-কার কোনও বছর হবে।

শ্রীপান্থ

বাঘের নাম হুমদো, বাঁদরের নাম টৌনি। থাকে সুন্দরবনে। দুজনে ভারী ভাব। ডালের উপর টৌনি বসেছে, তলায় হুমদো। সুখ-দুঃখের কথা হচ্ছে।

হুমদো বলে, "দু-দুটো দিন পেটে কিচ্ছু পড়েনি। জল খেয়ে আছি।"

"কেন, কেন?"

হরিণগুলো ভয়-তরাসে হয়ে গেছে। একটা গাছের পাতা পড়লেও দৌড়ে পালায়।

টৌনি বলে, "গাঙে-খালে মাছ তো আছে।"

হুমদো বলে, "নেই। জেলেরা জাল টেনে টেনে চিংড়ি-চুনো অবধি ছেঁকে নিয়ে যায়। বেলান্ত কাদা ঘেঁটে আমার কপালে শুধু শেওলা-শামুক।"

টৌনির দিকে তাকিয়ে বলে, "তুই খাসা আছিস ভাই। খাস ফলপাকুড়—ঠ্যাং তুলে তারা পালাতে পারে না, ডালের বোঁটায় ঝুলে থাকে।"

টৌনি বলে, "ঝুলত না, ফলটল সব খতম হয়ে যেত, শুধু বন নিয়ে যদি পড়ে থাকতাম। গাঁ-গ্রামে গিয়ে চরে ফিরে খাই. সেই জন্য অভাব হয় না।"

হুমদো ধরে বসল, "আমিও গাঁ-গ্রামে যাব। যাইনি কখনো। তাই ভয়-ভয় করে। কিন্তু না গিয়ে আর চলছে না।" টৌনি সাহস দিয়ে বলে, "কিসের ভয়? যে গাঁয়ে ইচ্ছে ঢুকে পড়বি, গরু-বাছুর ছাগল-কুকুর হাঁস-মুরগি দেদার ধরে ধরে খাবি। চাই-কি মানুষও—"

হুমদো শিউরে উঠে বলে, "ওরে বাবা, ঐ জন্তুর শুনেছি বুদ্ধি সাংঘাতিক।"

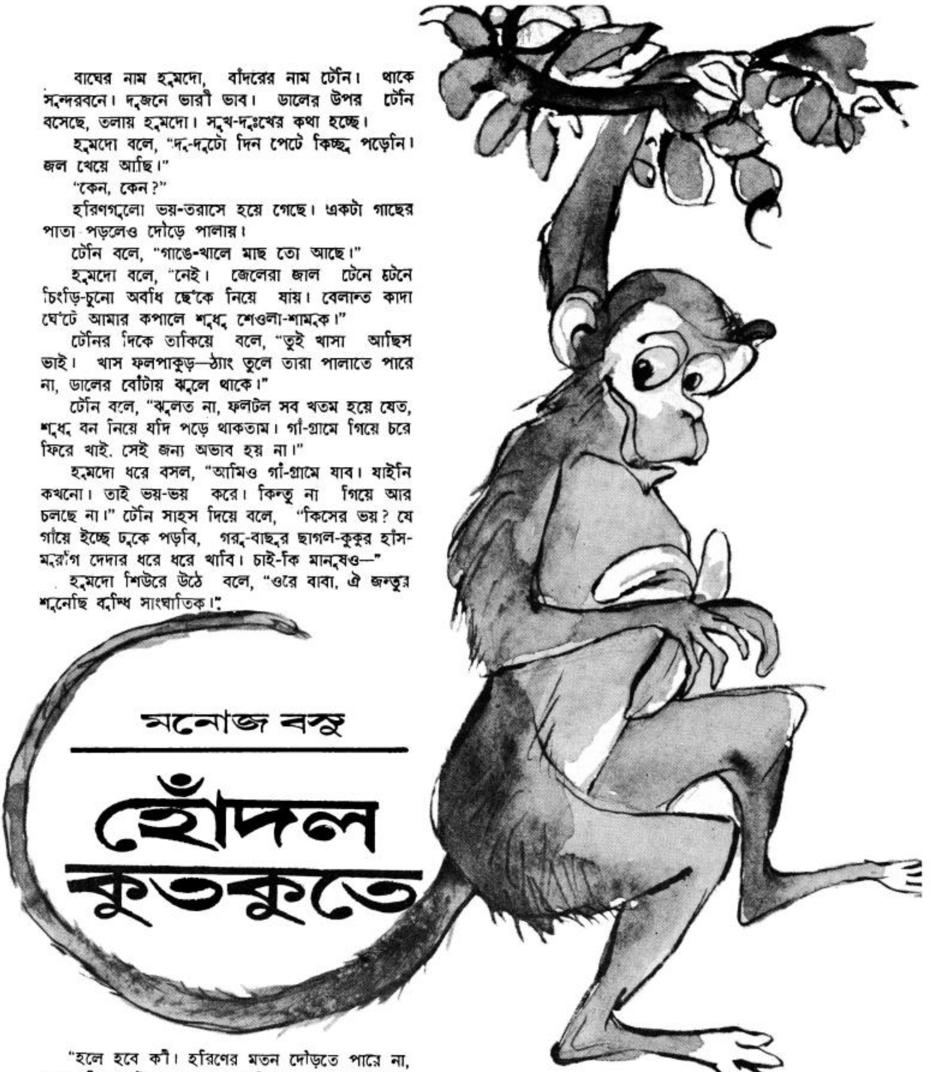

মনোজ বসু

হোঁদল কুতকুতে

"হলে হবে কী। হরিণের মতন দৌড়তে পারে না, জোড়া শিং নেই গরুর মতন। বাঁদর আমরা আঁচড়াই-কামড়াই, ওদের সে-ক্ষমতা নেই, এমন কী কষে দাঁত খিঁচিয়ে খানিকটা ভয় দেখাবে, সেটুকুও পারে না। চারখানার জায়গায় পা মোটে দুটো, নেংচে নেংচে বেড়ায়। ঘাড় মটকানো অতি সোজা, ধরলেই কাত।"

হুমদোর ভয় তবু একেবারে যায় না। বলল, "অজানা গাঁয়ে যাব না ভাই। যে তল্লাটে তুই যাস, পথ-ঘাট ভাল করে বাতলে দে, আজ আমি সেখানে চলা-ফেরা করব। গিয়ে গিয়ে পাকাপোক্ত হলে তখন আর বাছাবাছি লাগবে না।"

বড়োসড়ো এক গ্রাম, বাদাবন থেকে সামান্য দূরে। দালান কোঠা, খোড়োঘর, আমকাঁঠালের বাগবাগিচা অগুন্তি। টৌনি আজ-কাল সেখানে যাচ্ছে। জ্যৈষ্ঠ মাস—গাছে গাছে মহাস্ফূর্তিতে আম খায়, কাঁঠাল খায়, লিচু খায়। হাটের দোকানে মর্তমান কলার কাঁদি টাঙানো—টুক করে কাঁদিসুদ্ধ নিয়ে টৌনি চালের উপর বসে, কলা খায় আর খোসা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে হাটুরে মানুষের গায়ে। হুমদো গিয়ে হাজির সেখানে—সেই গ্রামের রায়-বাড়ি।

রায়েরা বড়লোক—শৌখিনও। গ্রাম জায়গায় পাকা-রাস্তার অভাব বলে মোটরগাড়ি রাখা চলে না—ঘোড়ার-গাড়ি রেখেছেন। এবং গাড়ির জন্য কোচোয়ান, ঘোড়ার জন্য সহিস। বাবুদের ঝকমকে অট্টালিকার কাছেই কোচোয়ান ও সহিসের খোড়োঘর। ঘর-কানাচে ঝোপ-জঙ্গল—অন্ধকার দস্তুরমতো। হুমদোকে টৌনি পই-পই করে বলে দিয়েছে, পেটের ক্ষিধেয় আগে বেরিয়ে পড়িসনে, ঝোপেঝাপে গা ঢাকা দিয়ে থাকবি। চারিদিকে নিশুত হয়ে গেলে তারপর বেরুনো—খাওয়াদাওয়া তখন। তা খাসা জায়গা মিলেছে বটে। হুমদো ঘাপটি মেরে রইল।

জানলা খোলা, ঘরের মধ্যে বাচ্চা ছেলে কাঁদছে। কান্না থামাতে মা হরেক চেষ্টা করছে। বলে, "চুপ চুপ! শিয়াল এসেছে খোকন, কান্না থামাও। নয়তো ক্যাঁক করে টুঁটি ধরে নিয়ে যাবে।"

হুমদোর চমক লাগে, দেখল নাকি তাকে? আঁধারে আবছা রকম দেখে জলজ্যান্ত বাঘকে শিয়াল বলে ঠাউরেছে। বাচ্চা থামবে কী, কান্নার জোর আরও বাড়িয়ে দিল। হুমদো ভাবছে, একরত্তি মানুষের ছানা—কিন্তু সাহস কী বিষম! শিয়াল শুনে আমলই দিল না মোটে।

মা এবারে বলে, "খোকনমণি, কেঁদো এসেছে রে, কানাচে আছে। চুপ, চুপ!"

হুমদোকেই বুঝি কেঁদো বলছে। মন্দের ভাল। কেঁদোও বাঘ বটে, তবে জাত্যাংশে ছোট। কুলীন বাঘেরা নাক সিঁটকায়, কেঁদোর সঙ্গে ওঠা বসা করে না। তা হলেও তারাও খানিকটা-বাঘ, না মেনে উপায় নেই।

মা বলছে, "গোয়ালে ঢুকে বাছুর নিয়ে গিয়েছিল, কান্না শুনে এক্ষুনি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে। শিগ্‌গির থামো, নয়তো দোর ভেঙে ঢুকল বলে।"

থামতে বয়ে গেছে! কান্নার আরও জোর। হুমদো তাজ্জব ঃ মানুষ নামের জন্তু কী দুর্দান্ত রে? এক ফোঁটা ছেলে—তারও দাবরাব।

কিছুতে না-পেরে মা এবারে বাঘই এনে ফেলল। "খোকন রে, বাঘ এসে গেছে। যেমন-তেমন নয়—বাঘের রাজা রয়াল-বেঙ্গল হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়বে—চুপ, চুপ!"

খোকনের দৃকপাত নেই। কান্নার সঙ্গে এবারে পা-দাপানি। মা রেগে যায় ঃ "তবে রে ছেলে, বড্ড জেদ হয়েছে তোমার! হোঁদল কুতকুতেকে ডাকি, এসে চুলের ঝুঁটি ধরে নাচাক। হোঁদল, ও হোঁদল—"

আহ্বানমাত্রেই হোঁদল হাজির। হাজির হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল ঃ অ-র্‌-র্‌-র-র—। মা নিজেই গলার ভিতর থেকে আওয়াজ বের করে—খোকন জানে, হোদলের গর্জন। কান্না থামিয়ে সে একেবারে চুপ। ঘর-কানাচে হুমদো বাঘও হকচকিয়ে গেছে।

এর উপরে মা আবার শোলক পড়ে দিল ঃ

> হোঁদল বলে নাটাবনে কাঁটাগাছে আছি—
> যে ছেলেটা কাঁদে তার ঝুঁটি ধরে নাচি।

হুমদো ভাবছে, এত বনে-বাদাড়ে ঘুরি, হোঁদল কুতকুতে জানিনে তো। দেখিনি কখনো, নামও শুনিনি। নিশ্চয় কোন ভয়ানক জন্তু। দামাল বাচ্চা বাঘের রাজা রয়াল-বেঙ্গলকেও তাচ্ছিল্য করে, হোঁদলের নামে ঠাণ্ডা। সেই হোঁদল ঘরের মধ্যে—বেজখানার ওপারে। এত কাছাকাছি থাকা ঠিক হচ্ছে না—

আস্তাবলের ওদিকটা গাছে-গাছে অন্ধকার। সরে গিয়ে হুমদো গাছের নীচে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়াল।

কান্না থামিয়ে ফোঁপাচ্ছে খোকন। মা গায়ে হাত বুলোয়, আর হোঁদলকে নিরস্ত করে, "চলে যাও তুমি হোঁদল। খোকনবাবু ঘুমিয়ে গেছে—বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে। তাই না খোকন?"

"হুঁ।" বলল খোকন। ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

হঠাৎ গণ্ডগোল—বিষম চেঁচামেচি। চোর এসে রায়েদের অট্টালিকায় সিঁধ খুঁড়ছে. রায়কর্তা দেখে ফেলেছেন। 'ধর্‌ ধর্‌' করে চেঁচাচ্ছেন তিনি। বাড়ির লোকেরাও 'ধর্‌ ধর্‌' করছে। পালাচ্ছে চোর। দরোয়ান চাকরবাকর সব পিছু ছুটেছে।

কাকে ধরতে আসে—হোঁদলকে না হুমদো-বাঘকে? অন্ধকারে হুমদো আরও গুটিসুটি হল। চোর ছুটতে ছুটতে সেইখানটা এসে পড়েছে। হুমদোকে ভেবেছে ঘোড়া—আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া কী গতিকে বেরিয়ে পড়েছে। পাকা সওয়ার সে, এমন সুযোগ ছাড়বে কেন? এক লম্ফে হুমদোর পিঠের উপর। জিন-লাগাম নেই বলে চোর সর্বশক্তিতে গলা জড়িয়ে ধরেছে—হুমদোর দম আটকানোর গতিক। তার উপর চোরের কোমরে গোঁজা সিঁধকাঠি, ধারালো-মুখ হাতখানেক লম্বা লোহার শাবল, যা দিয়ে সে সিঁধের গর্ত খুঁড়ছিল। সিঁধকাটি হাতে নিয়ে দিল তিন-চারটে মোক্ষম ঘা কষিয়ে, ঘোড়া যাতে জোর ছুটে বেরোয়। ঘা খেয়ে হুমদো পিঠ বাঁকায় আর দৌড়য়। ভাবছে, হোঁদল ঘাড়ে চেপেছে. আর রক্ষে নেই। উঁঠি-পড়ি সে দৌড়চ্ছে।

রাত্রির শেষ প্রহর। চাঁদ উঠল এতক্ষণে, চারিদিকে ক্ষীণ জ্যোৎস্না। চোর তাকিয়ে দেখে—কী সর্বনাশ! ঘোড়া নয়, বাঘ। বাঘে চড়ে ছুটেছে সে। এখন উপায়?

বড় এক বাগিচার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নিচু ডাল পেয়ে তাই ধরে চোর ঝুল খেয়ে পড়ল। ফনফন করে গাছের মাথায় উঠে গেল সে। বাঘে গাছে চড়তে পারে না—খাও কলা!

হুমদোর খালি পিঠ, তবু কিন্তু ভয় ঘোচে না তার। দুরন্ত বেগে ছুটছে, হোঁদলে না তেড়ে ধরতে পারে। বাদাবনের বাসায় গিয়ে উঠলে তবে সোয়াস্তি। পরম বন্ধু টৌনিও ঐ বাগিচায় লিচু গাছে বসে মহানন্দে লিচু খাচ্ছে। সে দেখে, তীরের মতো কী যেন একটা আসছে। কাছে এলে চিনল।

"হুমদো, বাসায় ফিরছিস বুঝি? দৌড়স কেন রে?"

টৌনিকে পেয়ে ভরসা হল। দাঁড়াল সে একটুখানি। হাঁপাচ্ছে।

টৌনি শুধায়, "খাওয়া দাওয়া হল কেমন?"

"আর খাওয়া! খাওয়া মাথায় উঠে গেছে। হোঁদলে ধরেছিল!"

টৌনি অবাক হয়ে বলে, "হোঁদল কী?"

হুমদো ব্যাখ্যা করে বলে, "হোঁদল কুতকুতে।"

জিনিসটা আরও গোলমেলে হয়ে পড়ল। টৌনি বলে, "জন্মে তো নামই শুনিনি। কোন বস্তু সেটা? গাছ-পালা না পশুপক্ষী? জলে না ডাঙায় বেড়ায়? না, আকাশে?"

হুমদো বলল, "বলিস কী রে? পয়লা দিনই আমি হোঁদলের খপ্পরে পড়ে গেলাম, পিঠে চড়ে তাবৎ অঞ্চল ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াল—তুই এদ্দিনে নামটাও শুনিস নি?"

সড়াক করে টৌনি তলায় নেমে এলো। হুমদোকে কীরকম নাজেহাল করেছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনল

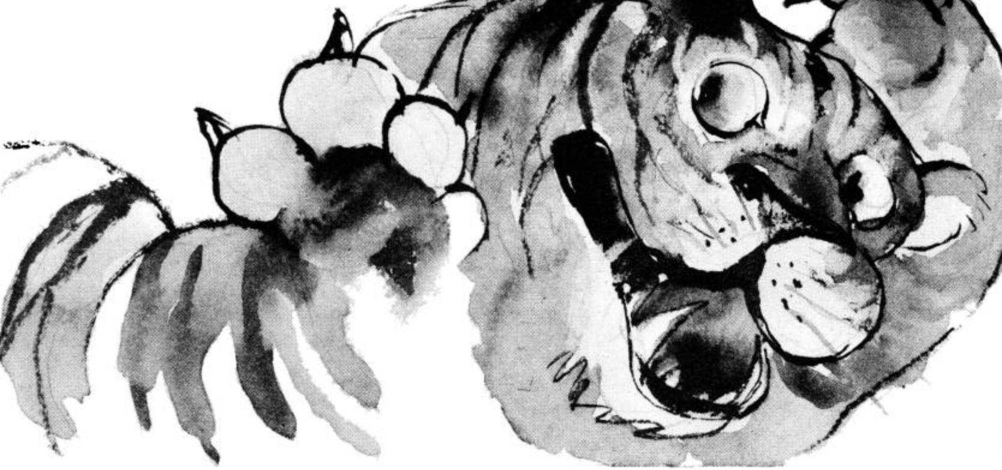

সব। রেগেমেগে তার হাত ধরে টানে। "কোন গাছে উঠেছে, আমায় দেখিয়ে দে। কেমন জন্তু, কতখানি তাগত ধরে, দেখব।"

হাত ছাড়াতে পারে না হুমদো, ভয়ে ভয়ে এগুতে হয়। দূর থেকে গাছ দেখিয়ে দিয়ে সে সরে দাঁড়াল। মস্ত বড় কাঁঠাল গাছ। পা টিপে টিপে গিয়ে টৌনি উঁকি ঝুঁকি দিল। ফিরে এসে হুমদোকে ছি-ছি করছে। "অ ঘেন্না, মানুষে একটা! বাঘ হয়ে তুই মানুষ বয়ে এলি—বাঘ জাতের তুই মুখ হাসিয়েছিস। শুনলে তারা থুতু দেবে তোর মুখে।"

শোধ না তুলে ছাড়াছাড়ি নেই। দুই বন্ধু বীরদাপে কাঁঠালতলায় গিয়ে হাজির। টৌনি বলল, "তলায় থাক তুই হুমদো, আমি গাছে চড়ছি। আঁচড়ে কামড়ে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দেবো, টুক করে তুই অমনি মুখে পুরবি।"

রাগে গরগর করতে করতে হুমদো বলে, "হাড় খাবো মাংস খাবো, চামড়া নিয়ে আমার মেয়েটার জন্য ডুগডুগি বানাবো।"

ঘোর বিপদ—গাছের উপর থেকে চোর দেখতে পাচ্ছে। বাঘ নীচে ওঁত পেতেছে, বাঁদর উঠে আসছে মতলব করে। গাছের গুঁড়িতে গর্ত—দিব্যি বড়সড় গর্ত একটা। চোর তার ভিতরে ঢুকে গেল।

"কাপুরুষ!" বলে বাঁদর ঘৃণাভরে গুঁড়ির উপর দুমদুম করে লাথি মারে। বলে, "লুকিয়ে বাঁচতে পারবিনে, আমিও কায়দা জানি। হয় বেরোবি, নয়তো দম আটকে মরে থাকবি গর্তের ভিতরে।"

বাঁদুরে ভাষায় কথা—চোর অবশ্য বুঝল না। মটমট করে মেলা ডালপালা ভেঙে টৌনি গর্তের মুখ আটকে দিল। নিজে তার উপর চেপে বসে—পাতালতা সরে না যায়, বাইরের বাতাস সামান্য ছিদ্রপথেও না ঢুকতে পারে। গ্যাঁট হয়ে বসে মুখ খিঁচিয়ে চার হাত নেড়ে টৌনি দেমাক করছে। "এইবারে কী করবি ওরে ব্যাটা মানুষ—"

উম-হুম হুড়ুম্দুম বাম্-মাম্—বাঁদুরে আর্তনাদ করে টৌনি গড়াতে গড়াতে গাছতলায় একেবারে হুমদোর পাশে। রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। দিশা না পেয়ে চোর সিঁধকাঠির ধারালো মুখ দিয়ে দারুণ খোঁচা মেরেছে টৌনির উরুতে। বীরত্ব-টিরত্ব উপে গিয়ে এখন টৌনি থরহরি কম্পমান। হুমদোকে বলে, "ঠিক বলেছিস ভাই। দেখতে মানুষের মতন, আসলে হোঁদল কুতকুতে। দাঁত বসিয়ে দিয়েছে—ওরে বাবা, ওরে মা, পুরো এক বিঘত মাপের দাঁত—"

মুহূর্ত আর দেরি নয়, ল্যাজ তুলে হুমদো দৌড় দিল। টৌনিকে বলে, "এক্ষুনি পালা, প্রাণে যদি বাঁচতে চাস।"

টৌনি পারে না। জখম বড় সাংঘাতিক। ছুটতে গিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল। ডুকরে কেঁদে ওঠে, "ফেলে যাসনে রে ভাই হুমদো। পিঠে তুলে নে। নয়তো হোঁদল নেমে এসে আমায় শেষ করবে।"

বাঘের পিঠে বাঁদর। হোঁদলের আতঙ্কে বাঘ পাঁইপাঁই করে ছুটছে। চোর দেখে গাছের গর্ত থেকে মুখ বাড়িয়ে।

ছবি এঁকেছেন ॥ শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

বিমল কর

কাপালিকেরা এখনও আছে

উপন্যাস

আগে যা ঘটেছে

তারাপদর তিন কুলে কেউ ছিল না। একদিন একেবারে আচমকা তারাপদ একটি চিঠি পেল। সলিসিটার মৃণাল দত্ত তারাপদকে দেখা করতে বলেছেন। চিঠি পড়ে মনে হল, ভুজঙ্গভূষণ হাজরা নামের এক ভদ্রলোকের দেড় দু লাখ টাকার সম্পত্তি তারাপদর ভাগ্যে নাচছে। কিন্তু কে এই ভুজঙ্গভূষণ? তারাপদ চেনে না। পদবী থেকে অনুমান হয়, তিনি তারাপদর এক পিসেমশাই হতেও পারেন। তারাপদ তার ডাক্তার-বন্ধু চন্দনকে নিয়ে মৃণাল দত্ত-র বাড়িতে দেখা করতে গেল সেদিনই সন্ধে বেলায়।

মৃণাল দত্ত পরীক্ষা করলেন—তারাপদকে; ভুজঙ্গভূষণের ঠিকানা দিলেন। মধুপুরের কাছে শঙ্করপুরে ভুজঙ্গভূষণ থাকেন। কিছুদিন আগে তাঁর এক দুর্ঘটনা ঘটেছে, তিনি মরণাপন্ন। ভুজঙ্গভূষণ জীবিত থাকতে থাকতে যদি তারাপদ শঙ্করপুরে তাঁর কাছে মৃণাল দত্ত-র চিঠি নিয়ে পৌঁছতে পারে—তবেই সে ভুজঙ্গভূষণের সম্পত্তি পেতে পারে, নচেৎ নয়।

সেদিন রাত্রেই তারাপদ চন্দনকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়িতে উঠল। গাড়িতে আলাপ হল এক মজার মানুষের সঙ্গে, নাম তাঁর কিংকরকিশোর রায়, ছোট করে 'কিকিরা'।

তারাপদরা কিকিরাকে প্রথমে সন্দেহ করতে লাগল। তাদের মনে হল, কিকিরা তারাপদর ব্যাগ থেকে কিছু হাতাবার মতলবে ওদের সংগী হয়েছেন। পরে সে-সন্দেহ দূর হল। মনে হল, কিকিরা তাদের বন্ধু হতে পারেন। কিকিরা বললেন, হ্যাঁ তিনি জানেন, তারাপদরা কোথায় যাচ্ছে, কার কাছে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে। ভুজঙ্গভূষণ যে কত বড় শয়তান, তাও তিনি বলে দিলেন।

শংকরপুরে ভুজঙ্গভূষণের বাড়িতে এসে তারাপদরা দেখল, বাড়িটা একটা দুর্গ। লোকজন কিন্তু চোখেই পড়ে না। সেখানে তারাপদ তার পরিচিত সাধুমামাকে দেখতে পেল। কিন্তু সাধুমামা তারাপদকে চিনতে পারলেন না যেন, কথাও বললেন না। বোবা হয়ে থাকলেন।

হলঘরে বসে থাকার সময়েই তারাপদরা বুঝতে পারল, তারা এক অদ্ভুত জায়গায় এসে পড়েছে। এই বিশাল বাড়ি, এত ফাঁকায়—এমনিতেই নিঝুম থাকার কথা; তার ওপর যদি এই বিরাট পুরীতে মানুষের সাড়া শব্দ, হাঁক ডাক, চলাফেরা না থাকে—তবে কেমন লাগে? তারা কলকাতার মানুষ, মানে হইহই রইরইয়ের মধ্যে মানুষ। কোন ভোর থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত সেখানে শুধু শব্দ আর শব্দ, মানুষজন থেকে গাড়ি ঘোড়া, রাস্তার খেঁকি কুকুরগুলোও কানের পর্দা ফাটিয়ে দেয় অনবরত। আর এখানে এই অদ্ভুত চুপচাপ। শুধু ডায়নামো চলার সেই ফট্‌ফট্‌ শব্দ; মাঝে মাঝে বাইরে দু-চারটে পাখির ডাক।

হলঘরটাও কেমন জাদুঘরের মতন দেখাচ্ছে। রীতিমত বড় ঘর কবেকার, কোন্ মান্ধাতা আমলের আসবাবপত্র কারিকুরি করা লোহার ফ্রেমের সোফা সেটি, বড় বড় আর্ম চেয়ার, মোগলাই নকশার একটা বড় সেণ্টার টেবিল, মোটা মোটা বেটপ আলমারি গোটা দুই, দেওয়াল জুড়ে নানা ধরনের সামগ্রী ঝুলছে, বাঘের মাথা, বুনো মোষের সিং, বড় বড় তীর-ধনুক, এক জোড়া খড়্গ, মা কালীর বিরাট পট, আর ওই সবের মধ্যে একটিমাত্র মানুষের ছবি। ফটো নয়, তেলরঙে আঁকা ছবি। ওই ছবি যে ভুজঙ্গভূষণের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওই মুখের দিকে তাকালে সমস্ত শরীর যেন থরথর করে কাঁপে, গায়ের লোমকূপে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বেশ লম্বা মুখ, খাঁড়ার মতন নাক, ভীষণ চওড়া কপাল; চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, কী তীব্র, তীক্ষ্ন। খুবই আশ্চর্য, ঘরের মাঝখানে যেখানেই তুমি বসো, মনে হবে ভুজংগভূষণ তোমায় দেখছে। ঘাড় পর্যন্ত ঝাঁকড়া এলোমেলো চুল, মুখভর্তি দাড়ি। দাঁত যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় মানুষটি বড় ভয়ংকর।

তারাপদরা বসে থাকল তো বসেই থাকল। চুপচাপ। ঘরের মধ্যে একটা বড় দেওয়াল-ঘড়ি টিকটিক করে বেজে যাচ্ছিল। আর তারাপদর বুকের মধ্যে ধকধক করছিল, গলা শুকিয়ে আসছিল।

এমন সময় একজন ঘরে এল। ছিপছিপে চেহারা, গায়ের রঙ কালো, অন্তত বছর চল্লিশ বয়েস, লালচে রঙের গেরুয়া পরনে, মাথায় রুক্ষ একরাশ কোঁকড়ানো চুল, দাড়ি নেই। লোকটার মুখের দিকে তাকালেই প্রচণ্ড ধূর্ত মনে হয়।

লোকটা দু মুহূর্ত তারাপদদের দেখল। তারপর বলল, "তোমাদের জন্যে ঘর ঠিক করা হয়েছে, এসো।"

তারাপদ বলল, "আমরা ভুজঙ্গবাবুর সঙ্গে দেখা করব।"

"এখন নয়। গুরুজীর অসুখ। তিনি বিকেলের পর দেখা করবেন।"

তারাপদ কী ভেবে বলল, "একবার একটুর জন্যে দেখা করা যায় না?"

"না; এখন নয়। দেখা করার সময় তিনি নিজেই

দেখা করবেন।"

তারাপদ ঢোক গিলল। চন্দন একটাও কথা বলছিল না। লোকটাকে দেখছিল। তার মনে হল, লোকটা মোটামুটি টেরা, গলার কাছে একটা জায়গা ফোলা, থায়রয়েড্ গ্ল্যান্ডের গোলমাল আছে বোধ হয়, চোখ দুটোও যেন সামান্য ঠেলে বেরিয়ে আসার মতন লাগছে।

তারাপদরা ঝোলাঝুলি নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আবার বারান্দায়। লোকটার পিছু পিছু হেঁটে বাড়ির একেবারে শেষ দিকে একটা ঘরে তারা এসে দাঁড়াল।

তারাপদ কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই লোকটা বলল, "আমার নাম মৃত্যুঞ্জয়। এখানে আমায় সকলে ছোট মহারাজ বলে।" বলেই তারাপদর দিকে তাকাল, "গুরুজী আদেশ দিয়েছেন, তোমার কাছে কাগজপত্র যা আছে, আমার হাতে দিতে। গুরুজী দেখবেন।"

তারাপদ ভাবল আপত্তি করে। কাগজপত্রগুলো নিজের হাতে ভুজঙ্গভূষণকে দেবার কথা। অবশ্য মৃণাল দত্ত বলে দেননি যে, হাতে-হাতেই দিতে হবে। পৌঁছে দেবার কথাই তিনি বলেছিলেন। এই মৃত্যুঞ্জয়কে কাগজপত্র দিলে কি কোনো ক্ষতি হবে? তারাপদ বুঝতে পারল না। লোকটা যখন এই বাড়িরই লোক, বোধ হয় ভুজঙ্গভূষণের ডান হাত—তখন একে দিতে আপত্তি কী? তাছাড়া ভুজঙ্গভূষণ তো বিকেলের আগে দেখাই করবেন না। কাগজপত্রের কথা ভুজঙ্গভূষণ বলে না দিলে এই লোকটা জানবেই বা কোথা থেকে?

তারাপদ একবার চন্দনের দিকে তাকাল। চন্দন চোখের ইশারায় দিয়ে দিতে বলল।

কিট ব্যাগ খুলে যা কিছু দেবার বের করে তারাপদ মৃত্যুঞ্জয়কে দিয়ে দিল।

চন্দন এতক্ষণ পরে কথা বলল। বলল, "কিছু মনে করবেন না, আমরা সারারাত ট্রেন জার্নি করেছি। খিদে তেষ্টা পেয়েছে। একটু চা পেলে অন্তত ভাল হয়।"

মৃত্যুঞ্জয় বলল, "ও হ্যাঁ, আমি দেখছি। ব্যবস্থা হয়ে গেছে।" বলে চলে যেতে গিয়ে আবার বলল, "এখানে কোনো অসুবিধে হবে না। কিছু দরকার হলে আমাদের জানিও। নাও, বিশ্রাম করো। কলঘরটা ডান দিকে।" বলে হাত দিয়ে বাথরুমের দিকটা দেখাল।

মৃত্যুঞ্জয় চলে যাবার পর তারাপদ নিচু গলায় বলল, "চাঁদু, এ কোথায় এলাম। আমার ভাল লাগছে না। সাধুমামা আমায় চিনতে পারল না। কেমন শরীর হয়ে গেছে! একটাও কথা বলল না। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না।"

চন্দন বলল, "তোর লোক চিনতে ভুল হয় নি তো?'

"কী বলিস! সাধুমামাকে চিনব না?"

চন্দন কোনো জবাব দিল না। ঘরটা দেখতে লাগল। বড় ঘর। দু পাশে দুই বিছানা। একটা দেরাজ একপাশে। গোটা দুয়েক চেয়ার। মাথার ওপর পাখা। ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে। শীতকাল বলে পাখা চালানোর প্রয়োজন নেই। আর দিনের বেলায় বাতি জ্বালানোর প্রশ্নই ওঠে না। পুবের মস্ত জানলা দিয়ে আলো আসছে, রোদ অবশ্য নেই, সরে গেছে।

চন্দন বলল, "দাঁড়া, আগে মুখ ধুই, চা খাই, তারপর ভাবব। এখন আর মাথা খুলছে না।"

চন্দন কিট ব্যাগ খুলে টুথব্রাশ, পেস্ট, তোয়ালে বার করল। এক টুকরো সাবানও।

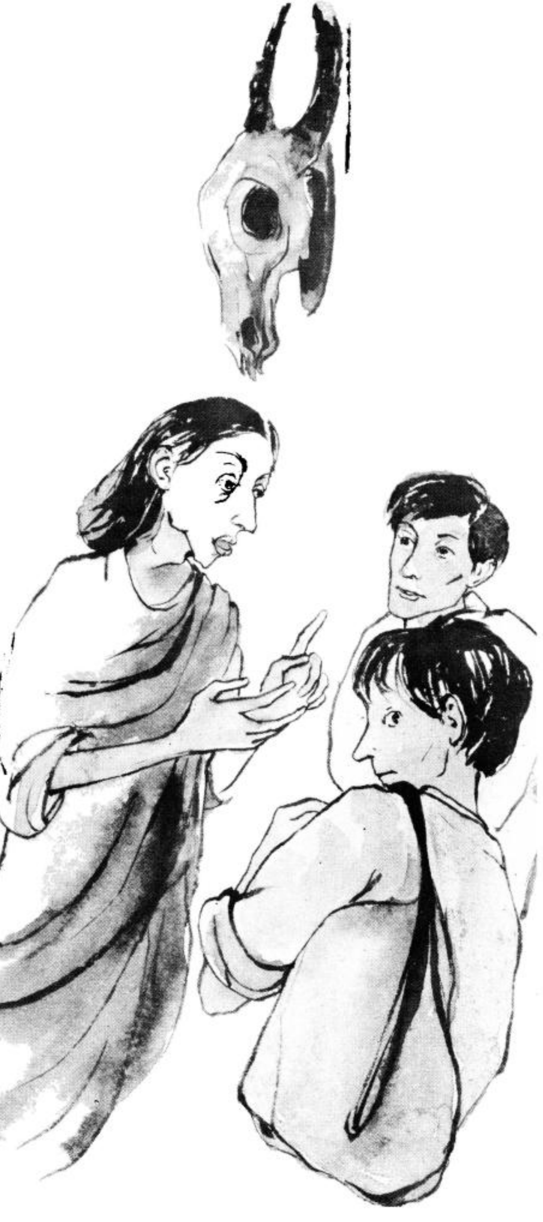

তারাপদও তার কিটব্যাগ খুলতে লাগল। তার মুখ দেখলেই মনে হয় সে বেশ উদ্বেগ এবং হতাশা বোধ করছে।

ঘরের ভেতর দিকের দরজা খুলে চন্দন একটা প্যাসেজ দেখল, তার গায়েই বাথরুম।

তারাপদ জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরটা একেবারে শেষের দিকের। জানলার গা ঘেঁষে বাগান, পেছনের দিকে আস্তাবল। একটা বাদামী রঙের ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে ফাঁকা জমিতে। তারাপদ বুঝতে পারল, ভুজঙ্গভূষণের বাড়িতে ঘোড়ার গাড়ি আছে।

সেই ফট্‌ফট্‌ শব্দটা হঠাৎ কখন থেমে গেছে তারাপদ বুঝতে পারেনি। আচমকা খেয়াল হল। কান পেতে থাকল সামান্য, না কোনো শব্দ নেই। সাধুমামার মুখ আবার তার মনে পড়ল। মানুষ না কঙ্কাল? কী হয়েছিল সাধুমামার? সাধুমামা কেন তাকে চিনতে পারল না? কেন কথা বলল না? সাধুমামা কি অসুখবিসুখে বোবা হয়ে গেছে? আশ্চর্য!

চন্দন ফিরে এসে বলল, "যা তারা, মুখটুখ ধুয়ে আয়। ফাইন্ জল এখানকার, রিফ্রেশিং...।"

তারাপদ নিঃশ্বাস ফেলে মুখ ধুতে চলে গেল।

চা জলখাবার এসেছিল। বাড়িতে তৈরী জলখাবার। মিষ্টিও। চা-টাও মন্দ নয়।

দুই বন্ধু চা খেতে খেতে নিচু গলায় কথা বলছিল।

চন্দন বলল, "শোন তারা, আমি সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু এতদূরে এসে আর ফিরে যাওয়া যায় না।

"এমন জানলে আমি আসতাম না, চাঁদু।"

"না এলে সম্পত্তি ফসকে যেত।" চন্দন যেন ঠাট্টাই করল।

তারাপদ মুখ কালো করে বলল, "যেত তো যেত। আমি গরিব ছিলাম, গরিব থাকতাম ; বটুকবাবুর মেসে আমার জীবন কেটে যেত। কিন্তু এ-কোথায় এলাম? মৃণাল দত্ত আমায় এতকথা বলে দেননি।"

চন্দন বলল, "এসে যখন পড়েছিস, দুটো দিন দেখে যা না কী হয়? আমাদের কী করবে ভুজঙ্গভূষণ? খুনও করবে না, জেলেও পাঠাবে না। যদি অবস্থা খারাপ দেখি, পালাব।

"কেমন করে পালাবি এই দুর্গ থেকে?"

"পালাব। সে-ভার আমার। ...এই বাড়িতে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে, তারা ; অ-নেক। এই রহস্যগুলো কী?"

তারাপদ বিরক্ত হয়ে বলল, "তুই শার্লক হোমস নাকি?"

চন্দন বলল, "শোন, তুই এ-বাড়িতে একটা মেয়েকে দেখেছিস?"

"মেয়ে? না।" তারাপদ অবাক।

"আমি দেখেছি," চন্দন বলল, "দোতলার দিকে ভেতর-বারান্দায় একটা মেয়েকে দেখলাম। একটুর জন্যে। মনে হল, খুব রোগা, ফরসা, বয়স কম।"

তারাপদ বলল, "ভুজঙ্গভূষণ বা তার চেলার কেউ হবে।"

"হতে পারে," চন্দন একটা সিগারেট ধরাল, "কাপালিকের বাড়িতে অতটুকু মেয়ে কেন?"

তারাপদর বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার কপালকুণ্ডলার কথা মনে পড়ে গেল। বন্ধুর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল তারাপদ।

ভুজঙ্গভূষণ যে অতিথিদের ব্যাপারে খুবই যত্নশীল সেটা বোঝা গেল। শীতের বেলা গড়িয়ে যাচ্ছিল, স্নান খাওয়া শেষ করল তারাপদরা। দোতলায় গিয়ে তাদের খেতে হল আসনে বসে। খেতে বসে মনে হল, এতরকম সুখাদ্য তারাপদ জীবনে খায়নি। মৃত্যুঞ্জয় তাদের তদারক করছিল। ঠাকুরগোছের একটা লোক খেতে দিচ্ছিল ওদের। সমস্ত কিছু পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন।

নিজেদের ঘরে ফিরে এসে চন্দন বলল, "তারা, তোর পিসেমশাই যে দারুণ খাতির করছে রে? এই রেটে যদি সাত দিন খাই আর ঘুমোই—এই শীতে একটা ফার্স্ট ক্লাস চেঞ্জ হয়ে যাবে।"

তারাপদ ঢেঁকুর তুলে বলল, "খাতিরের শেষটায় কী হয়, দেখ।"

"কেন, তুই সম্পত্তি পাবি, আর আমরা বগল বাজাতে বাজাতে কলকাতায় ফিরব।"

"সাধুমামাকে আর একবারও দেখছি না কেন বল তো?"

"কী জানি! হয়ত তাঁর অন্য কাজ।"

"মৃত্যুঞ্জয়কে তোর কেমন লাগছে?"

"একটা ক্যারেকটার।"

"লোকটা শয়তান বলে মনে হচ্ছে আমার।"

"পাকা শয়তান। ..নে এবার একচোট ঘুমিয়ে নে। ট্রেনে ভাই ভাল ঘুম হয়নি।" বলতে বলতে চন্দন বিছানায় শুয়ে পড়ল। হাতের সিগারেটটা টিপ করে জানলা দিয়ে ছুড়ে বাইরে ফেলে দিল।

তারাপদও প্রচুর খাবার পর একটা সিগারেট খাচ্ছিল। বলল, "চাঁদু, আজ একবার কিকিরার সঙ্গে দেখা করা যায় না? উনি তো বলেছেন বিকেলেই যশিডি থেকে ফিরবেন।"

চন্দন বলল, "আজ আর কী করে হবে? সন্ধের দিকে ভুজঙ্গভূষণের সঙ্গে দেখা হবে তোর। তারপর আর সময় কোথায়? স্টেশন কম দূর নয়।"

তারাপদ চুপ করে থাকল।

চন্দন বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল।

তারাপদরও আলস্য লাগছিল। শীতের দুপুরে চন্দন ঘুমোচ্ছে। বিছানায় গা গড়িয়ে নানারকম ভাবতে ভাবতে তারাপদও ঘুমিয়ে পড়ল।

তারাপদর ঘুম ভাঙল শেষ বেলায়। শীতের দিন। হুহু করে রোদ পালিয়ে আলো মরে আসছে। ঘরের মধ্যে ছায়া ছায়া ভাব। কেমন যেন বিষণ্ণ রঙ ধরে গিয়েছে বাগানে।

চন্দন ঘুমোচ্ছিল। তারাপদ হাই তুলতে তুলতে উঠল। জানলার কাছে দাঁড়াল। হাওয়া দিয়েছে শীতের, গাছপালায় সেই হাওয়া লেগেছে। দূরে যেন কোথায় একটা কাক ডাকছে। শব্দটা কানে খারাপ লাগছে না। গাছের পাতা উড়ে গেল বাতাসে, বোধ হয় ওই ইউক্যালিপটাস গাছটার শুকনো পাতা।

তারাপদ চোখেমুখে জল দিয়ে আসতে কলঘরের দিকে চলে গেল।

ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই দেখল জানলার কাছে সাধুমামার মুখ।

তারাপদ প্রথমটায় কেমন বিশ্বাস করতে পারেনি। যখন তার বিশ্বাস হল, তখন আর সাধুমামা নেই। কী যেন একটা বিছানার দিকে ছুঁড়ে দিয়েই সাধুমামা

চলে গেছেন।

তারাপদ তাড়াতাড়ি এসে জানলার কাছে দাঁড়াল। জানলায় গরাদ, মুখ বাড়ানো যায় না। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল তারাপদ—সাধুমামাকে দেখতে পেল না। ডেলাটা তুলে নিল তারাপদ। ধীরে ধীরে খুলল। এক টুকরো কাগজে কী যেন লেখা সিস-পেনসিলে ; পড়তে কষ্ট হয়।

তারাপদ পড়ল ঃ "তুমি শেষ পর্যন্ত যমপুরীতে পা দিয়েছ। এসে ভাল করেছ। খুব সাবধানে থাকবে। আমি আছি। তোমায় পরে সব বলব। আমি বোবা সেজে আছি। এই যন্ত্রণা থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার করবে বাবা? এ-কাগজে রেখো না। নষ্ট করে ফেলো।"

তারাপদর সর্বাঙ্গ পাথর হয়ে গেল। সাধুমামা বোবা সেজে রয়েছে। কেন? তারাপদ তাদের উদ্ধার করতে পারে, মানে? কাদের? কারা এখানে বন্দী? কেন?

তারাপদ ভয়ে কেমন যেন হয়ে গিয়ে চন্দনকে ঠেলা মেরে জাগিয়ে তুলতে লাগল।

"চাঁদু, এই চাঁদু ; ওঠ্...।"

চন্দন ধড়মড় করে উঠে বসল। ভেবেছিল, না জানি কী ঘটেছে ; উঠে বসে দেখল, ঘরটা ছায়ায় ভরা, তারাপদ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

তারাপদ বলল, "আচ্ছা ঘুম ঘুমোচ্ছিস! সন্ধে হয়ে গেল। ওঠ্। ...এইটে পড়ে দেখ্।"

ঘুম জড়ানো ছলছলে চোখে চন্দন বলল, "কী ওটা?"

"সাধুমামার চিঠি।"

চন্দন চিঠিটা নিল। চোখ ঝাপসা, কোনো রকমে পড়ল। বার দুই তিন। তারপর বলল, "এখানকার সবই মিস্টিরিয়াস।"

এ-বাড়ির আরও বড় রহস্য তারাপদরা সন্ধের দিকে জানতে পারল।

শীতের দিন ; বিকেল ফুরোতেই সন্ধে। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। কলকাতার মানুষ তারাপদরা, অন্ধকার দেখার সুযোগ কমই জোটে ; জুটলেও এমন চারপাশ জুড়ে থমথমে অন্ধকার দেখার অভিজ্ঞতা তাদের নেই। তার ওপর শীত। কুয়াশা জমছে মাঠঘাটে। কোনো দিকেই তাকানো যায় না।

মৃত্যুঞ্জয় এসে জানিয়ে গিয়েছে, সামান্য পরে সে এসে তারাপদদের ভুজঙ্গভূষণের কাছে নিয়ে যাবে। তারাপদরা জামা-প্যান্ট পরে তৈরী হয়ে বসে আছে। সেই ফট্‌ফট্‌ শব্দটা আবার বিকেলের পর থেকে শোনা যাচ্ছিল। ডায়নামো চলছে আর কি। ঘরে বাতি জ্বলছিল।

তারাপদর বুকের মধ্যেও ধকধক করছিল। ভুজঙ্গভূষণের কাছে যেতে হবে। জীবনে যাকে কোনোদিন দেখেনি, যার নামও তিন দিন আগে পর্যন্ত তার জানা ছিল না সেই লোকটার কাছে। অথচ এই লোকই তারাপদকে দেড় দু লাখ টাকার সম্পত্তি দিয়ে যেতে ডেকে পাঠিয়েছে। এমন মানুষকে দেখার আগে এমনিতেই বুক কাঁপার কথা। তার ওপর সেই মানুষ যদি এত রহস্যময় ও ভয়ঙ্কর হয় তবে কেমন লাগে? তারাপদর মুখ গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল, বুকে যেন অনবরত কেউ হাতুড়ি পিটছে।

চন্দন তারাপদর চেয়ে সাহসী। তবু তারও ভয় হচ্ছিল।

তারাপদ কাঠের মতন শুকনো গলা করে বলল, "চাঁদু, কী হবে?"

চন্দন বলল, "কিছু ভাই বুঝতে পারছি না। যাই হোক, আমাদের নিশ্চয় মেরে ফেলবে না। কাপালিকই হোক আর শয়তানই হোক—আজকের দিনে মানুষকে বাড়িতে ডেকে এনে মেরে ফেলা মুশকিল। পুলিসে ধরবে। আমরা দুজন যে এ-বাড়িতে এসেছি তার প্রমাণ কলকাতার মৃণাল দত্ত থেকে শুরু করে এখানে সাধুমামা পর্যন্ত সবাই দিতে পারবেন।"

তারাপদ ভয় সামলাবার জন্যে ঘন ঘন সিগারেট খেতে লাগল।

শেষে মৃত্যুঞ্জয় এল। বলল, "এসো।"

তারাপদরা উঠল।

ফাঁকা ফাঁকা ঘর, বারান্দা, সিঁড়ি দিয়ে তারাপদরা দোতলায় এল। দোতলার ভেতর বারান্দা দিয়ে হেঁটে একটা ছোট ঘরের কাছে এসে মৃত্যুঞ্জয় বলল, "ওই ঘরে যাও। ঘরে ধোয়ানো ধুতি, ফতুয়া, গরম চাদর আছে। তোমাদের এই জামাপ্যান্ট পালটে নেবে, জুতো-মোজা খুলে রাখবে। জানলার দিকে জল আছে। হাত ধুয়ে নেবে। নোংরা, বাইরের জামা-কাপড়ে গুরুজীর কাছে যাওয়া যায় না।"

চন্দন প্রতিবাদ করে বলল, "আমরা লন্ড্রির প্যান্ট জামা পরেছি।"

"তা হোক ; এখানের এই নিয়ম। বাইরের কোনো পোশাকেই কাউকেই গুরুজীর কাছে যেতে দেওয়া হয় না।"

"আমি ধুতি পরতে পারি না," চন্দন বলল।

"তাহলে তুমি থাকো।"

তারাপদ চন্দনের হাত ধরে টানল। "ঠিক আছে—আমি তোকে ধুতি পরিয়ে দেব।"

ওরা দুজনে পোশাক পালটাতে পাশের ঘরে চলে গেল।

ঘরে ঢুকে চন্দন রাগের গলায় বলল "যত্ত বাজে নিয়ম। কোনো মানে হয়? কোন মহারাজ তোর পিসেমশাই যে তাকে দেখতে হলে ধুতি পরতে হবে। কেমন শীত দেখছিস। ধুতির ভেতর দিয়ে ঢুকে হাড় কাঁপাবে।"

তারাপদ বলল, "কপাল ভাই। কিছু করার উপায় নেই।"

চন্দন যে একেবারেই ধুতি পরতে পারে না তা নয়, বছরে এক-আধ দিন পরে, রীতিমত যুদ্ধ করে।

ওরা জামা প্যান্ট ছেড়ে ধুতি ফতুয়া পরতে লাগল।

পোশাক পালটে তারাপদরা বাইরে এল। মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়িয়ে আছে। বলল, "এসো।"

বারান্দার গা-লাগানো একটা প্যাসেজ ঘুরে সামনের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল মৃত্যুঞ্জয়। বলল, "ভেতরে যাও, বসবার জায়গা আছে, গিয়ে বসে থাকো। কথাবার্তা বলো না।"

দরজা ভেজানো ছিল, মৃত্যুঞ্জয় খুলে দিল।

তারাপদরা ঘরে পা বাড়াল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সামনেই মোটা ভারী পরদা। পরদা সরিয়ে ঘরের মধ্যে তাকাতেই চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেল। কিছু দেখা যায় না। মনে হল, সিনেমা আরম্ভ হয়ে যাবার পর হলে ঢুকলে যেমন চোখে কিছু দেখা যায় না, অনেকটা সেইরকম। কিন্তু সিনেমার হলে তবু এদিকে ওদিকে চোরা

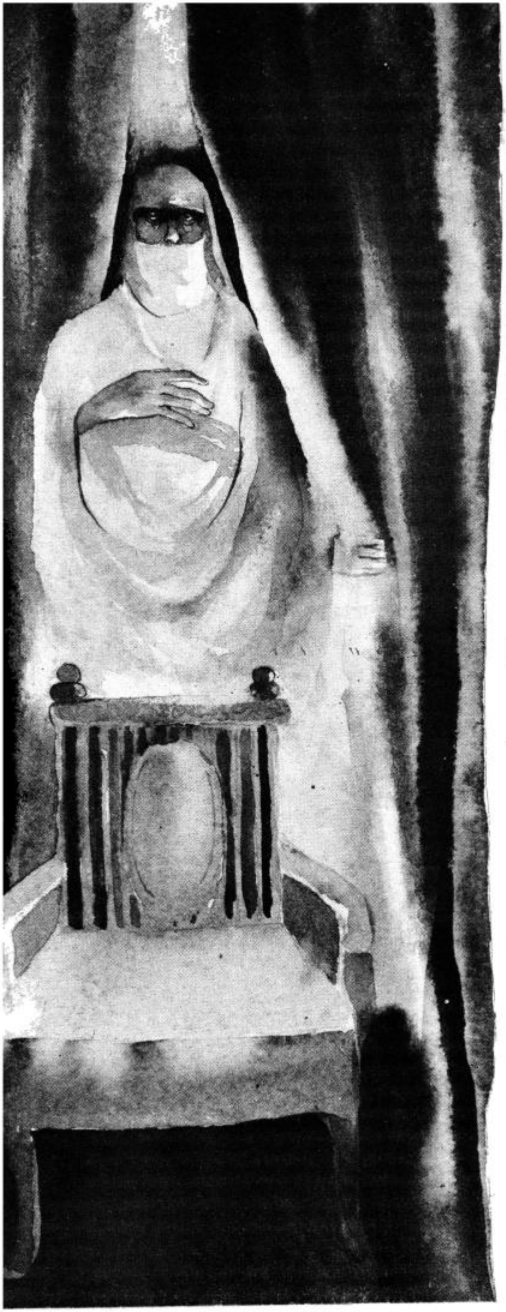

আলোর ব্যবস্থা থাকে. ছবি দেখানোর আলোও এক একসময় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এখানে ওসব কিছু না। মিটমিট করে দুপাশে দুই চোরা দেওয়াল-আলো জ্বলছে যদিও. তবু সেই আলোয় কিছু দেখা যায় না।

দুই বন্ধু পাশাপাশি থমকে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে চোখ সয়ে এলে খুব অস্পষ্টভাবে ঘরটা চোখে পড়ল। ঘরের মাঝখানে দুটো চেয়ার। দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে বসে থাকা ভাল ভেবে দুজনে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চলল। পায়ের তলায় যে কী আছে বোঝা যাচ্ছে না। মনেই হয় না মাটিতে পা : যেন কোনো তুলোর মধ্যে পা ডুবে যাচ্ছে, এতো নরম! কোনো সন্দেহ নেই. খুব দামী কার্পেট পাতা রয়েছে ঘর জুড়ে, কার্পেটের রঙটাও হয় কালো. না হয় ঘন লাল— কালচে দেখাচ্ছে. অবশ্য এই অন্ধকারে সবই কালচে দেখাচ্ছে।

তারাপদরা কোনো রকমে চেয়ারে এসে বসল। বসামাত্র মনে হল. যেন নরম গদির মধ্যে সমস্ত শরীরটা ডুবে গেছে।

ভয় দু জনেরই বুকের ওপর চেপে বসেছে। তবু চোখ আরও খানিকটা সয়ে আসায় তারা ঘরের চারপাশ দেখছিল। ঘর নিশ্চয় ছোট নয়। দেওয়ালগুলো দেখা যায় না। সারা ঘরে কেমন এক সুন্দর গন্ধ। দামী ধূপের নাকি কোনো আতর ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে বোঝা যায় না। গন্ধটা বাতাসে ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছিল। তাদের চেয়ারের সামনে—খানিকটা তফাতে আরও একটা চেয়ার চোখে পড়ল। তারাপদদের দিকে মুখ করা। সিংহাসনের মতনই যেন। উঁচু, বড়। মনে হল— বেশ যেন বাহারী। চেয়ারের দু পাশে পরদা। ভেলভেটের পরদা বুঝি। কোঁচানো হয়ে ঝুলছে। ঠিক একেবারে ছোট স্টেজের দুটো উইংসে। মাথার ওপর দিকটা এত অন্ধকার যে, কোথায় ছাদ বোঝা যাচ্ছে না।

হঠাৎ চন্দন তারাপদর হাত আঁকড়ে ধরল। ধরে ফিসফিস করে বলল, "তারা, সেই বেড়াল।"

তারাপদ তাকাল। ভেলভেটের পরদার একপাশে, ছোট্ট একটা গোল টেবিলের ওপর সেই কালো বেড়াল, মৃণাল দত্তের বাড়িতে যেমন দেখেছিল তারা। অন্ধকারে তার গা দেখা যাচ্ছে না, চোখের মণিদুটো শুধু জ্বলজ্বল করছে। নিশ্চয় কালো বেড়াল। মৃণাল দত্তের বাড়ির বেড়ালের মতনই মরা, সাজানো বেড়াল। নয়ত একই জায়গায় বসে থাকবে কেন?

চন্দনের হাত ঘামছিল। সে বেড়ালের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। নিশ্চয় ঘুরবে, মুখ ফেরাবে।

এমন সময় ভেলভেটের পরদার দিকে আর-একটা চোরা আলো জ্বলে উঠল। লাল আলো। মৃদু তার আভা।

আর তারাপদরা দেখল এক ভৌতিক আকৃতি ডান দিকের পরদা সরিয়ে এসে দু মুহূর্ত দাঁড়াল। তারপর সেই সিংহাসনের মতন চেয়ারে বসল ধীরে ধীরে।

ভয় দুজনেরই গলায় এসে জমা হয়েছে। জিব শুকনো। বুক যেন আর সইতে পারছে না এত জোরে ধকধক করছে হৃদপিণ্ড। শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। অসাড় লাগছে। কাঁপছে হাত পা।

মানুষটি যে কী পরেছে বোঝা যাচ্ছে না। হয়ত আলখাল্লা। রক্ত-গৈরিক রঙের। তার মাথা থেকে গলা পর্যন্ত একটা ঢাকা পরানো, শুধু নাক মুখ আর চোখের জায়গাটা খোলা। তারাপদরা প্রচুর ইংরেজী ছবি দেখেছে।

তাদের মনে হল, এককালে এইরকম মুখোশ পরে রাজা রাজড়ারা গোপন জায়গায় যেত, এইরকম মুখোশ পরেই কেউ কেউ অনাচার অত্যাচার করতে বেরিয়ে পড়ত; দুশমন দমন করতেও যেত।

এই কি ভুজঙ্গভূষণ?

হঠাৎ সেই মানুষটি গম্ভীর চাপা গলায় বলল, "তারাপদ, আমি তোমার পিসেমশাই ভুজঙ্গভূষণ।"

উঠে গিয়ে প্রণাম করার কথা তারাপদ ভুলে গেল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "আমার মুখ পুড়ে গিয়েছে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তোমাদের দেখতে ভাল লাগবে না। তাই এটা পরেছি। তুমি আমার মুখ দেখতে পাচ্ছ না বলে আমারই কষ্ট হচ্ছে। আমার শরীর ভাল নয়। তোমায় শুধু দেখতে এসেছি। তুমি এসেছ, আমি খুশী হয়েছি।"

তারাপদ সাহস করে বলল, "মৃণালবাবু আমার হাত দিয়ে কিছু কাগজপত্র আর চিঠি দিয়েছিলেন আপনাকে দেবার জন্যে। আপনি পেয়েছেন?"

"পেয়েছি।... ওই ছেলেটি তোমার বন্ধু, ডাক্তার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। মৃণালবাবুর মুখে শুনলাম, আপনার অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে—তাই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। কী হয়েছিল আপনার?"

"কী হয়েছিল তুমি ঠিক বুঝবে না। অগ্নিচক্রের মধ্যে মুখ ছিল, মনটা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। একাগ্রতা নষ্ট হয়ে গেলে পাপ হয়। সেই পাপের ফল।"

"অগ্নিচক্র কী?"

"তোমরা বুঝবে না। না দেখলে বুঝতে পারবে না। এই যে ঘরে তোমরা বসে আছ, এই ঘরে পরলোক থেকে আত্মারা আসেন। আমি তাঁদের ডেকে আনি। তাঁরা আসেন, দেখা দিয়ে যান. কত লোক তাদের হারানো প্রিয়জনকে এখানে একটু দেখতে আসে। আত্মা অদৃশ্য। তাকে দেখা যায় না। তবে সদয় হলে তাঁরা আমাদের নানা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যান। অনেক সময় স্পর্শও করে যান। চিহ্নও রেখে যান কোনো কোনো সময়ে।... ওই দেখো, একজন এসেছেন...এই মুহূর্তে এসে গেছেন।" বলতে বলতে যেন ভুজঙ্গভূষণ কেমন হয়ে গেলেন, মাটি থেকে একটা বড় পুজোর ঘণ্টা উঠিয়ে নিয়ে বাজালেন সামান্য। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার।

সেই নিকষ কালো অন্ধকারে মাথার ওপর ক্ষীণ একটু আলো জ্বলে উঠল। আর কোথা থেকে একটা লাল বল, সোনালী ডোরা দেওয়া, ঘরের মাঝখানে এসে হাজির হল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "আপনি কে আমি জানি না। যদি আমার পরিচিত হন আপনার আসার প্রমাণ দিন।"

বলার পর বলটা কাঁপতে লাগল, নড়তে লাগল, তারপর ধীরে ধীরে শূন্যে উঠতে লাগল, ভাসতে ভাসতে ওপরে ছাদের দিকে উঠে গেল, ওপরের আলোয় সেই লাল আর সোনালী রঙের বলটা ঝকঝক করে উঠল। বলটা আবার সামান্য নেমে এল। নেমে এসে লাফাতে লাফাতে ঘরের ডান দিক থেকে বাঁ দিক পর্যন্ত চলে গেল। আবার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে আসতে লাগল।

তারাপদ ভয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার মতন।

চন্দন দু চোখ বন্ধ করে ফেলল।

(ক্রমশ)

ছবি এঁকেছেন ॥ শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

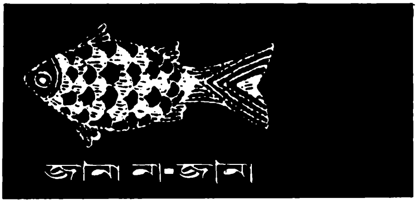

জানা না-জানা

সাপের বিষে সাপের কিছু হয় না কেন?

বাবুরাম সাপুড়েকে ছেলেটি কী ধরনের দুটো সাপ রেখে যেতে বলেছিলো, মনে আছে তো? 'যে সাপের চোখ নেই শিং নেই', ইত্যাদি। সাপের অবশ্য শিং থাকার কথা নয়; তবে ছেলেটির আর্জিমাফিক জড়ভরত সাপ কিন্তু ভূভারতেও পাওয়া যাবে না।

অবশ্য সাপমাত্রই যে বিষধর তা নয়; বরঞ্চ উল্টোটাই ঠিক, অধিকাংশ সাপই নির্বিষ। অন্যদিকে আবার মারাত্মক বিষধর সাপও আছে, যেমন কেউটে বা শঙ্খচূড়—যা দংশন করলে মানুষ বা অন্য জীবজন্তুর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, যদি না তৎক্ষণাৎ ভালো চিকিৎসা হয়। অবশ্য সব চিকিৎসাও অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে যায়। অল্প-বিষাক্ত সাপও আছে, যেগুলি কামড়ালে, মারা না গেলেও, বিষের যন্ত্রণায় আমরা ছটফট করবোই।

কিন্তু এইসব মারাত্মক কিংবা অল্প-বিষধর সাপ তো নিজের মুখে বিষ নিয়ে দিব্যি থাকে, কোনো ক্ষতি হয় না ওদের; এমন কী, বিষাক্ত সাপের দংশনে অন্য সাপের শরীরে কোনোরকম বিষক্রিয়াই হয় না। ব্যাপারটা বেশ ভাবিয়ে তোলে না কি?

প্রাণীদেহের মূল উপাদান হলো অণুকোষ। ঐ অণুকোষের রাসায়নিক গঠন ও প্রকৃতির মধ্যেই এই ভাবিয়ে-তোলা রহস্যের সমাধান রয়েছে। এক ধরনের প্রাণীর সঙ্গে অন্য ধরনের প্রাণীর মৌলিক পার্থক্য হলো, প্রত্যেক ধরনের প্রাণীর অণুকোষের নিজস্ব গঠন ও প্রকৃতি আছে; মূল উপাদান, অণুকোষের নিজস্ব রসায়নেই একজাতীয় প্রাণীর আদত নিজস্বতা। বিষ যখন ঐ অণুকোষে ক্ষতিকরভাবে ক্রিয়া করে, আমরা বলি শরীরে বিষক্রিয়া হচ্ছে। যে-কোনো ধরনের বিষ যে-কোনো ধরনের অণুকোষে এমন ক্ষতিকারক ক্রিয়া করে না—সবকিছুই নির্ভর করছে উভয়ের রসায়নের ওপর। সাপের **বিষ** এবং সাপের অণুকোষ এমনই যে, সাপের অনুকোষে সাপের বিষ কোনোরকম ক্ষতিকরভাবে ক্রিয়া করে না; ফলে বিষক্রিয়াও হয় না কোনো। মানুষ বা অন্য জীবজন্তুর অণুকোষ এমনই যে, সাপের বিষ সেখানে ক্ষতিকর ক্রিয়া করে।

নিজস্ব অণুকোষের রসায়ন অনুযায়ী প্রত্যেক প্রাণীই, তার টিঁকে থাকার জন্যই, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, কিছু কিছু জিনিস সৃষ্টি করে নিতে পারে, কিন্তু এমন কিছুই সে তৈরী করে নিতে পারে না, যা তার নিজের পক্ষেই বিষ। একমাত্র মানুষই পারে, মানুষের বুদ্ধি তাকে শিখিয়েছে এইসব। অন্য প্রাণীর তো আর বুদ্ধি তেমন নেই, যা আছে, তা হলো সহজাত আবেগ বা প্রবৃত্তি; ঐ সহজাত আবেগ বা প্রবৃত্তি টিঁকে থাকে ও বংশরক্ষায় পরিচালিত করে, কোনোরকম আত্মবিনাশের ফন্দি দেয় না।

ছুটির দিনের ছবি

তারাপদ রায়

পুজোর ছুটি প্রায় এসে গিয়েছে। বৃষ্টির জোর অনেক কম। বহুদূরে কোথাও নদীর তীরে কাশফুল ফুটে দিক-দিগন্ত ছেয়ে গেছে, তারই আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে ঘর-বাড়ি, পথ-ঘাট। কলকাতার চাপা গলি-তেও সেই আলো এসে পড়েছে।

তাতাইবাবুদের বাড়ির দোতলায় ডাক্তারবাবুদের টবে একটা ছোট শেফালি ফুলের গাছ আছে। সেই গাছ থেকে এখন প্রতিদিন সকালবেলায় তাতাইবাবুদের সিঁড়িতে দু-একটা করে ফুল টুপটাপ করে ঝরে। তাতাইবাবুর বিড়াল কৃষ্ণকান্ত একটু সন্দেহপ্রবণ চরিত্রের, সে ঐ সিঁড়ির পাশেই রান্নাঘরের দিকে মুখ করে সকাল থেকে বসে থাকে, প্রত্যেকটি ফুল যেই হাওয়ায় দুলতে দুলতে সিঁড়ির উপর নেমে আসে, কৃষ্ণকান্ত সতর্কভাবে প্রথমে থাবা দিয়ে উলটিয়ে, তারপর মুখ দিয়ে শুঁকে পরীক্ষা করে দেখে সেটা আরশোলা-মাকড়শার মত জীবন্ত কিছু কিনা। এরই মধ্যে আবার মাঝে মাঝে কৃষ্ণকান্ত রান্নাঘরের ছাদে উঠে শরৎকালের সকালের সোনালী রোদে চিৎ হয়ে শুয়ে লেজ নাচায় আর কখনো-কখনো একচোখ বুজে কী যেন গভীরভাবে দেখে, মনে হয় ঝকঝকে সুন্দর আকাশের নীল রঙ আর হালকা সাদা মেঘ দেখছে, কিন্তু তাতাইবাবু জানেন তা নয়, আসলে কৃষ্ণকান্ত জানলার উপরে বসা দুটো চড়ুই পাখির উপরে তাক করছে।

চড়ুইপাখিরাও কিন্তু কৃষ্ণকান্তের এই বদবুদ্ধি অনেকদিন হলো জেনে ফেলেছে, তারা সব বুঝতে পারে কখন কৃষ্ণকান্ত হঠাৎ স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে উঠবে, তার ঠিক এক মুহূর্ত আগেই তারাও সবাই একসঙ্গে কিচমিচ করে লাফিয়ে উঠে ছাদের কার্নিশে উড়ে যায়। কৃষ্ণকান্ত বারবার জব্দ হয়, কিন্তু তবু তার লজ্জার বালাই নেই।

তাতাইবাবু অবশ্য বলেন, কৃষ্ণকান্ত নাকি এই মাসখানেক আগে একবার একটা চড়ুই প্রায় ধরে ফেলে-

ছিলো, থাবা দিয়ে তার একটা পালক-ও ছিঁড়ে নিয়েছিলো ; তাতাইবাবুর কাছে সেই পালকটা এখনো আছে, অঙ্কখাতার ভাঁজে রেখে দিয়েছেন, কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলেই সেটা বার করে দেখান, ছোট একটু পালক, কালচে রঙের। তাতাইবাবুর বন্ধু ডোডোবাবু কিন্তু এটা স্বীকার করেন না, তিনি বলেন ওটা কাকের পালক, তাতাইবাবু উঠোনে কি রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছেন, চড়ুইয়ের পালক কালো হবে কেন?

এই নিয়ে এবং আরো কত কী নিয়ে তাতাইবাবু আর ডোডোবাবুর মাঝেমধ্যেই ঝগড়া হয়। দুজনের এই প্রাত্যহিক ঝগড়া এককেদিন একেক বিষয়ে, এর কোনো শেষ নেই।

আর দু-একদিন হয়েই ইস্কুল ছুটি। সেকেন্ড টার্মিন্যাল পরীক্ষা মিটে গিয়েছে। ওদিকে রাস্তার ওপাশে সন্ধ্যাসঙ্ঘের উঠোনে পুজোর মণ্ডপের জন্য কাঠ-বাঁশ সব নামানো হয়েছে, 'শ্রী দুর্গার আরাধনায়' লালশালু টাঙানো হয়ে গেছে। চারদিকে কেমন ঝলমলে ভাব। তাতাইবাবু একটা জলচৌকিতে বসে কৃষ্ণকান্তের ক্রীড়াকৌশল দেখছেন আর ভাবছেন ফুটপাথের বাদামি নামের কুকুরটার সদ্য পাঁচটা বাচ্চা হয়েছে, তাদের কার কী নাম দেওয়া যায়, একবার ঠিক করেছিলেন গ্রীক নাম দেবেন, সেলুকাস, মেগাস্থিনিস, আলেকজান্দার ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাদামির পাঁচটার মধ্যে চারটে বাচ্চাই মেয়ে আর তাতাইবাবু গ্রীক মেয়েদের নাম একেবারেই জানেন না।

তাতাইবাবু এইসব সাতপাঁচ ভাবছেন, এর মধ্যে ডোডোবাবু এলেন। এসে তাতাইবাবুর জলচৌকির একপাশে বসলেন, তাঁর মুখটা যেন কেমন ভার-ভার। আজ কৃষ্ণকান্তের প্রসঙ্গে তাঁর রুচি নেই, বাদামির বাচ্চাদের নামকরণের ব্যাপারেও তাঁর কোনো কৌতূহল নেই। এদিকে রান্নাঘরের ছাদ থেকে কৃষ্ণকান্ত নেমে এসেছে, এসে জলচৌকির উপরে ডোডোবাবু আর তাতাইবাবুর মধ্যখানে নিজেকে গলাবার চেষ্টা করছে। ডোডোবাবু হঠাৎ কৃষ্ণকান্তের গলা ধরে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

তাতাইবাবু অবাক, 'কী হলো, আপনার মাথা এত গরম কেন?' ডোডোবাবু চুপ করে রইলেন। তাতাইবাবুর কেমন সন্দেহ হলো, 'কী হলো, পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে নাকি?' ডোডোবাবু চটে উঠলেন, 'আমার রেজাল্ট বেরিয়েছে তো আপনার কী?'

তাতাইবাবু বললেন, 'আমার আর কী! আমার রেজাল্ট তো আর ছুটির আগে বেরোবে না। যেমন আপনাদের ইস্কুল, এমন সুন্দর পুজোর ছুটি, তার আগে-রেজাল্ট বার করে, ওদের কি হৃদয় বলে কিছু নেই?'

তাতাইবাবুর কথাটা যেন ডোডোবাবুর মনে একটু ধরলো, তিনি একটু শান্ত হয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আরে মশায়া রেজাল্ট তো এখনো বেরোয় নি, সে বেরোবে সামনের সোমবার যেদিন ছুটি হবে, এর মধ্যেই অবস্থা কাহিল হয়ে উঠেছে।'

তাতাইবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'ফল না বেরোতেই অবস্থা কাহিল, সে কী কথা মশায়?'

ডোডোবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেমে থেকে দুঃখিত, গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'জানেন, আমার বাংলার খাতাটা ইস্কুলের দিদিমণিদের হাতে হাতে ঘুরছে। সবাই মিলে পড়ছে, সবাই মিলে দেখছে।'

ডোডোবাবুর এই উন্নতিতে তাতাইবাবু বিস্মিত বোধ করলেন, 'কী এমন লিখলেন সবাই মিলে দেখছে, কেউ কিছু বুঝতে পারছে না, নাকি আপনাদের দিদিমণিদের মাথায় কিছু নেই?'

ডোডোবাবু আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, তারপর বললেন, 'আর দিদিমণি, এখন আর দিদিমণিদের ব্যাপার নেই, আমার খাতা দেখে তাঁদের সকলের মাথা ঘুরে গেছে, এখন খাতা নাকি আমাদের হেড স্যারের কাছে যাবে।'

তাতাইবাবু স্তম্ভিত হয়ে চোখ গোল-গোল করে বললেন, 'এমন কী সাংঘাতিক লিখেছিলেন?'

এত দুঃখের মধ্যেও ডোডোবাবুর চোখের কোণে একটু হাসির রেখা দেখা দিলো, একটু ম্লান হেসে বললেন, 'সবই তো ঠিক ছিলো, শুধু ঐ বাক্য-রচনা, ঐ পাতাগুলো ব্যাকরণ-বই থেকে হারিয়ে গিয়েছিলো, শেখা হয়নি, তাই বানিয়ে বানিয়ে লিখতে হয়েছিলো, তা'ও সব সোজা-সোজা।'

তাতাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী সোজা-সোজা?'

'আরে সবই সোজা,' ডোডোবাবু বললেন, 'প্রথমে দিয়েছিলো অকাল কুষ্মাণ্ড, কী মানে কে জানে, নিশ্চয় ফল-টল হবে, লিখে দিলাম, অকালকুষ্মাণ্ড খাইতে অতি সুস্বাদু।'

এই শুনে থমকে গিয়ে তাতাইবাবু একটা ঢোঁক গিলে বললেন, 'লিখলেন?'

ডোডোবাবু বললেন, 'হ্যাঁ লিখলাম, তার পরেরটা অবশ্য বেশ সোজা, সুখের পায়রা, লিখলাম, হাতিবাগান বাজারে সুখের পায়রা দশটাকা করিয়া জোড়া পাওয়া যায়।'

তাতাইবাবু বললেন, 'তারপর?' ডোডোবাবু বললেন, 'আর তারপর। তারপর, ডুমুরের ফুল, বসন্তকালে ডুমুরের ফুলের শোভায় মন আকুল হয়।'

তাতাইবাবু মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'সর্বনাশ।' ডোডোবাবুর এখন প্রবাদবাক্যের দিকে ঝোঁক এসে গেছে, তিনিও মাথায় হাত দিলেন, দিয়ে আপন মনে বললেন, 'কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।'

ডোডোবাবুর এই উক্তি শুনে তাতাইবাবু বললেন, 'সাবাস, এ কথাটা তো বেশ বুঝে বললেন।'

ডেডোবাবু বললেন, 'বুঝবো না? ব্যাকরণের সেই পাতা কটা পরীক্ষার পরে খাটের নীচে খুঁজে পেলাম, সেটা পড়েই তো বুঝতে পারছি, কী সর্বনাশ করেছি।'

এই দুঃখের কথা শুনে ডোডোবাবুকে তাতাইবাবু কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাক্য আরম্ভ করা হলো না। কৃষ্ণকান্ত এতক্ষণ কোথায় যেন ওঁত পেতে বসে ছিলো, সেখান থেকে উঠোনে বিদ্যুৎ-চমকের মত নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়লো, কিন্তু আবার ব্যর্থ হলো, কিছুই করতে পারলো না। উঠোনে একজোড়া চড়ুই পাখি কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিলো, তারা ঠিক সময়ে ফুড়ুত করে উড়ে গেলো, আর গিয়ে বসলো ডাক্তারবাবুদের টবের শেফালি ফুলগাছের ডালে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু ফুল টুপটুপ করে ঝরে পড়লো উঠোনে। যেন কিছুই হয়নি এইরকম পরম বৈরাগ্যের ভঙ্গিতে সেই ফুল ঝরে পড়া দেখতে লাগলো উদাসীন কৃষ্ণকান্ত।

ডোডোবাবু সেই দিকে তাকিয়ে আলগা গলায় তাতাইবাবুকে বললেন, 'আপনার কৃষ্ণকান্ত আকাশকুসুম একদম পছন্দ করে না দেখছি।'

ডোডোবাবুর এই বাক্যরচনা দেখে তাতাইবাবু বললেন, 'আর ভয় কী? এই তো চমৎকার শিখে ফেলেছেন, আসুন এবার কৃষ্ণকান্তের গায়ে একঘটি জল ঢেলে ওকে ভিজে বিড়াল বানিয়ে দেই।'

এই কথা শুনে ডোডোবাবু বোধহয় ভাবলেন, তাতাইবাবু ঠাট্টা করছেন, তিনি কেন যেন ভয়ঙ্কর চটে গেলেন, তাতাইবাবুকে বললেন, 'আপনি নিজেই একটি ভিজে বিড়াল।'

তাতাইবাবু আজ অনেক সহ্য করেছেন, তিনিও খেপে গেলেন।, আবার দুজনের ঝগড়া শুরু হলো, সে ভীষণ ঝগড়া, কিন্তু আজকের ঝগড়ার ভাষা একেবারে অন্যরকম। শরৎকালের নীল আকাশ, সাদা মেঘের নীচে ঝলমলে রোদে দাঁড়িয়ে ডোডোবাবু-তাতাইবাবু পরস্পর পরস্পরকে আশ্চর্য ভাষায় গালাগাল করতে লাগলেন।

ডোডোবাবু তাতাইবাবুকে বললেন, 'আপনি ভিজে বিড়াল।'

তাতাইবাবু ডোডোবাবুকে বললেন, 'আপনি বকধার্মিক।'

ডোডোবাবু তাতাইবাবুকে বললেন, 'আপনি কলুর বলদ।'

তাতাইবাবু ডোডোবাবুকে বললেন, 'আপনি বিদুরের ক্ষুদ।'

ডোডোবাবু তাতাইবাবুকে বললেন, 'আপনি ধর্মের কল।'

তাতাইবাবু ডোডোবাবুকে বললেন, 'আপনি তুলসীবনের বাঘ।'

এইরকম চললো সারা সকাল জুড়ে। চড়ুই পাখিরা আর উঠোনে নামতে সাহস পেলো না এই ঝগড়ার মধ্যে, আর কৃষ্ণকান্ত বারান্দায় বসে অবাক হয়ে যখন ডোডোবাবু গাল দেন তখন ডোডোবাবুর মুখের দিকে তাকায়, আর যখন তাতাইবাবু গাল দেন তখন তাতাইবাবুর মুখের দিকে তাকায়।

ছবি এঁকেছেন ॥ প্রণবেশ মাইতি

অঙ্কের মজা মজার অঙ্ক

শুভঙ্কর

চারজন বন্ধুর হাতে চার-টুকরো কাগজ দাও। প্রথম জনকে বলো, ইচ্ছেমতন তিনটে রাশি লিখতে। লেখা হয়ে গেলে, পাশাপাশি সেই তিনটে সংখ্যাকেই আরেকবার লিখতে বলো।

(ধরো, সে লিখল, ৫২৮। তাহলে সংখ্যাটা দাঁড়াল, ৫২৮৫২৮।)

পরের বন্ধুকে সংখ্যাটি বলতে বলো। লিখে জানানোই ভালো, তুমি না হলে শুনে ফেলবে। পরের বন্ধুটিকে বলো পুরো সংখ্যাটাকে ৭ দিয়ে ভাগ করতে।

না, ভাগশেষ থাকবে না। সুতরাং ভাগফলটি তৃতীয় বন্ধুর হাতে চালান করে দিতে বলো।

তৃতীয় জনকে বলো, ১১ দিয়ে ভাগ দিতে।

এবার চতুর্থ বন্ধুর পালা। ১১ দিয়ে ভাগ দেবার পর যে-সংখ্যাটি রইল সেটা চতুর্থ বন্ধু পাবে। এক্ষেত্রেও ভাগশেষ কিছু থাকছে না। চতুর্থ জনকে বলো, ১৩ দিয়ে ভাগ দিতে।

হয়েছে? এবার ভাগফলটি তুমি হাতে করে নিয়ে আড় চোখে দেখে নাও। মনে রাখো। কাগজটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলো। প্রথম বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মনে-করে-রাখা ভাগফলটি বলো, বেশ জোরে।

এইটেই তার ইচ্ছেমতন লেখা তিনটি সংখ্যা।

শক্ত লাগছে? মোটেই শক্ত নয়। আচ্ছা, প্রথম উদাহরণটিই কষে দেখা যাক। প্রথম বন্ধু লিখেছে ৫২৮৫২৮।

> দ্বিতীয় বন্ধুর হাতে সংখ্যাটি দাঁড়াল (৫২৮৫২৮÷৭)=৭৫৫০৪; তৃতীয় বন্ধু ১১ দিয়ে ভগ দিল। অর্থাৎ সংখ্যাটি হল (৭৫৫০৪÷১১)=৬৮৬৪ ; চতুর্থ বন্ধু একে ১৩ দিয়ে ভাগ করে তোমাকে উত্তর জানাবে।
>
> অর্থাৎ, (৬৮৬৪÷১৩)=৫২৮। প্রথম বন্ধুর মনোনীত সংখ্যা।

ম্যাজিকের মতো দেখানো যায় অঙ্কটি, তাই না? আসলে কী হচ্ছে? তিনটে সংখ্যা দুবার করে লেখা মানে ১০০১ গুণ করে তোলা।

৫২৮৫২৮=৫২৮×১০০০+৫২৮

এবারে ৭ দিয়ে, ১১ দিয়ে আর ১৩ দিয়ে ভাগ দেওয়া মানে (৭×১১×১৩) সেই ১০০১ দিয়েই ভাগ দেওয়া। সুতরাং সংখ্যাটি ফিরে আসছে।

সাধু কালাচাঁদের নতুন কাজ

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

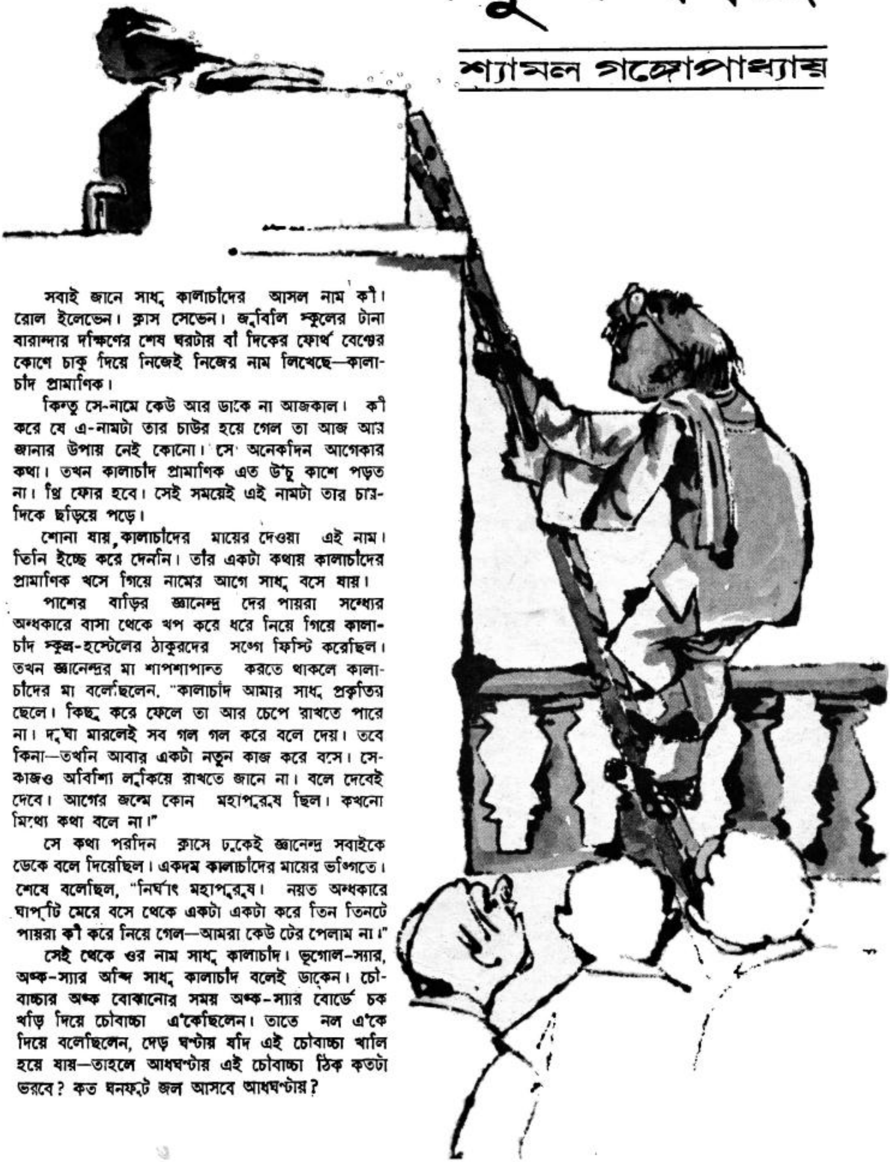

সবাই জানে সাধু কালাচাঁদের আসল নাম কী। রোল ইলেভেন। ক্লাস সেভেন। জুবিলি স্কুলের টানা বারান্দার দক্ষিণের শেষ ঘরটায় বাঁ দিকের ফোর্থ বেঞ্চের কোণে চাকু দিয়ে নিজেই নিজের নাম লিখেছে—কালাচাঁদ প্রামাণিক।

কিন্তু সে-নামে কেউ আর ডাকে না আজকাল। কী করে যে এ-নামটা তার চাউর হয়ে গেল তা আজ আর জানার উপায় নেই কোনো। সে অনেকদিন আগেকার কথা। তখন কালাচাঁদ প্রামাণিক এত উঁচু কাশে পড়ত না। থ্রি ফোর হবে। সেই সময়েই এই নামটা তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

শোনা যায়, কালাচাঁদের মায়ের দেওয়া এই নাম। তিনি ইচ্ছে করে দেননি। তাঁর একটা কথায় কালাচাঁদের প্রামাণিক খসে গিয়ে নামের আগে সাধু বসে যায়।

পাশের বাড়ির জ্ঞানেন্দ্র দের পায়রা সন্ধ্যের অন্ধকারে বাসা থেকে খপ করে ধরে নিয়ে গিয়ে কালাচাঁদ স্কুল-হস্টেলের ঠাকুরদের সঙ্গে ফিস্টি করেছিল। তখন জ্ঞানেন্দ্রর মা শাপশাপান্ত করতে থাকলে কালাচাঁদের মা বলেছিলেন, "কালাচাঁদ আমার সাধু প্রকৃতির ছেলে। কিছু করে ফেলে তা আর চেপে রাখতে পারে না। দু'ঘা মারলেই সব গল গল করে বলে দেয়। তবে কিনা—তখনি আবার একটা নতুন কাজ করে বসে। সে-কাজও অবিশ্যি লুকিয়ে রাখতে জানে না। বলে দেবেই দেবে। আগের জন্মে কোন মহাপুরুষ ছিল। কখনো মিথ্যে কথা বলে না।"

সে কথা পরদিন ক্লাসে ঢুকেই জ্ঞানেন্দ্র সবাইকে ডেকে বলে দিয়েছিল। একদম কালাচাঁদের মায়ের ভঙ্গিতে। শেষে বলেছিল, "নির্ঘাৎ মহাপুরুষ। নয়ত অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে থেকে একটা একটা করে তিন তিনটে পায়রা কী করে নিয়ে গেল—আমরা কেউ টের পেলাম না।"

সেই থেকে ওর নাম সাধু কালাচাঁদ। ভূগোল-স্যার, অঙ্ক-স্যার অব্দি সাধু কালাচাঁদ বলেই ডাকেন। চৌবাচ্চার অঙ্ক বোঝানোর সময় অঙ্ক-স্যার বোর্ডে চক খড়ি দিয়ে চৌবাচ্চা এঁকেছিলেন। তাতে নল এঁকে দিয়ে বলেছিলেন, দেড় ঘণ্টায় যদি এই চৌবাচ্চা খালি হয়ে যায়—তাহলে আধঘণ্টায় এই চৌবাচ্চা ঠিক কতটা ভরবে? কত ঘনফুট জল আসবে আধঘণ্টায়?

অঙ্কটা মিলিয়ে দিল ক্লাশের চার পাঁচজন। সবচেয়ে আগে মেলালো জ্যোতির্ময় ঘোষাল। রোল ওয়ান।

কিন্তু পরদিন স্কুলে এসে আর জল মিলল না। টিফিনের পর হুলুস্থুলু কাণ্ড। একফোঁটা জল নেই ট্যাঙ্কে।

মভরু সবাইকে জল দেয়। আজ তিরিশ বছর দিচ্ছে। ফাঁকা গ্লাসগুলোয় জল ভরে দাঁড় করিয়ে রাখে। তারও মুখ শুকনো। মিউনিসিপ্যালিটি সকালে একবার বিকেলে একবার জল দেয়। দুপুরে কোথায় জল পাওয়া যাবে?

তখন অঙ্ক-স্যার লোহার মই বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। ট্যাঙ্কের মুখ খুলে ভেতরে উঁকি দিলেন। তারপর চাতালের ওপর ঘোরাঘুরি করলেন। নিচের থেকে মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই তা দেখতে পেল।

টিফিনের পর ফিফথ্ পিরিয়ডে অঙ্ক-স্যার ক্লাসে ঢুকেই বললেন, "এই স্কেলখানা কার? যার হয় এগিয়ে এসো। সত্যি কথা বললে কিছু হবে না।"

সবাই জানে, এ হল গিয়ে স্যারের ফাঁদ।

অঙ্কস্যার স্কেলখানা উলটে বললেন, পেছনে লেখা আছে কে পি। ক্লাশ সেভেন।

কে পি-তে অনেক রকম নাম হয়। কমলেন্দু পাঠক। রোল সেভেন। কাজল পালিত। রোল থার্টিওয়ান। আবার রোল ইলেভেনের কথাও মনে আসে। কালাচাঁদ প্রামাণিক।

তিনজনকেই একসঙ্গে দাঁড় করালেন স্যার। প্রথমে কমলেন্দু। সে কারও সাতে-পাঁচে থাকে না। নদীর ওপার থেকে খেয়া নৌকোয় করে পড়তে আসে। বর্ষাকালে শহরেই দাদুর কাছে থাকে। ভাল কোদাল কোপায়। গাছ বসায়। সে বলল, "আমায় মারবেন না স্যার। আমার পিঠে ফোঁড়া। মরে যাব।"

"তুই যা।" বলে স্যার কাজল পালিতকে ডাকলেন। সে এমনিতে খুব রোগা। তারপর চোখে চশমা। অঙ্কে কোনদিন একুশের বেশি পায়নি। সেকেণ্ড চান্সে প্রোমোশন পায়। স্মৃতিশক্তির জন্যে আজ তিন মাস হল ব্রাহ্মিশাকের রস খাচ্ছে। সে বলল, "স্যার ও স্কেল আমি কোনদিন দেখিনি। আমি রুল দিয়ে লাইন টানি।"

স্যার এবার ডাকলেন। বলা যায় হাক দিলেন। "সাধু কালাচাঁদ!"

ইয়েস স্যার।

"কাছে এসো। এই স্কেলটিকে চিনতে পারো?"

"না স্যার।"

"ভাল করে দ্যাখো।"

কাছে গিয়ে কালাচাঁদ ভালো করে উল্টে পাল্টে দেখলো।

"চেনা মনে হয়?"

চোখের সামনে তুলে ধরে ভাল করে পরখ করে

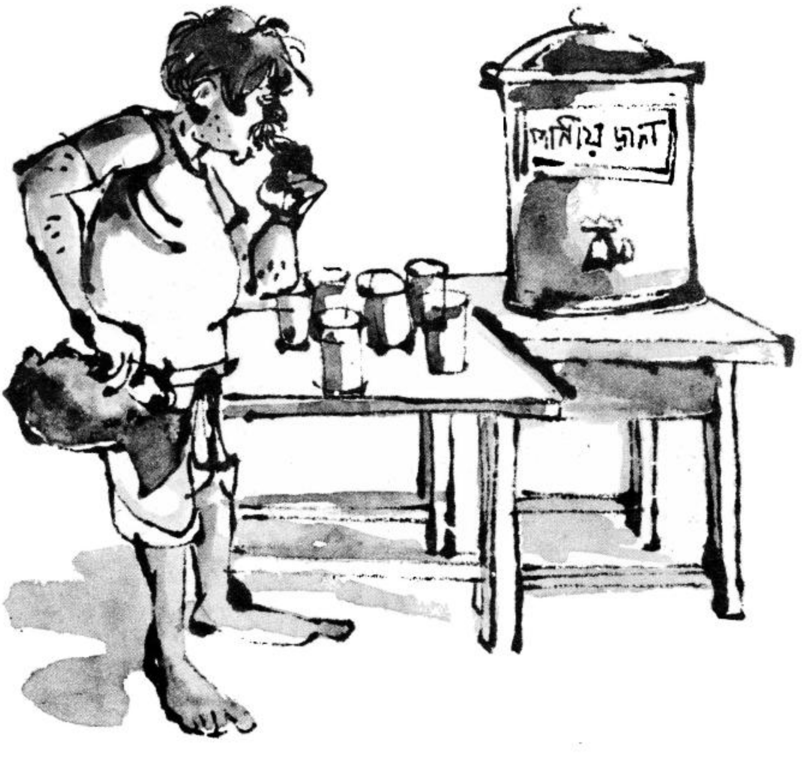

দেখছিল কালাচাঁদ। একধায় পট-পট করে তিন চারবার পলক পড়ল চোখের।

"মনে পড়ছে না স্যার।"

"ভাল করে দ্যাখো। যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে। বলা তো যায় না—"

"তা ঠিক স্যার অবশ্য।" বলতে বলতে কালাচাঁদ কোমরের ঢলঢলে প্যাণ্টটা দু'হাতে বুক অব্দি টেনে তুললো। বাঁ হাঁটুর শুকনো ঘা-খানা টিফিনের সময় কী করে কেটে গিয়ে আবার চিন চিন করছে। এখন চুলকোনোর জন্যে ঝুঁকলেই স্যার সন্দেহ করতে পারেন। তাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তিত অবস্থায় বাঁ হাতখানা মাথায় রাখল। সেখানে চুল নেই। নাপিতের কাঁচি লেগে একটি স্থায়ী গোলমাল হয়ে আছে। কবিরাজের পরামর্শে চুল বড় হলেই বাবা নিজের হাতে শোধন করা কাঁচিতে ছেঁটে দিয়ে ঘৃতকুমারীর রস লেপে দেন। অন্যদিন মাথার চারদিকে মাছি ওড়ে। আজ টিফিনের চড়চড়ে রোদে রস শুকিয়ে যাওয়ায় কিছুক্ষণ হল আর মাছি দেখা যাচ্ছে না। নয়ত মাথার পেছনে ছটার মত থাকবেই।

স্যার চেঁচিয়ে উঠলেন এবারে। "কী অবশ্য? ভালো করে দ্যাখো।

"দেখেছি স্যার। চিনতে পারছি না।" বলতে বলতে পেটটা ফোলালো। নয়ত হাফপ্যাণ্ট আবার নাইয়ের নিচে নেমে হাঁটুর মালাইচাকি ঢেকে দিত।

"গৌরাঙ্গ হ। হ বলছি।"

কালাচাঁদ গৌরাঙ্গ হয়ে গেল। হরিনাম গাওয়ার ভঙ্গীতে হাত দু'খানা ওপরে। হাঁটু একটু ভাজ করা। ঘা খানা আরও চিরে গেল। কিন্তু কোন শব্দ করা চলবে না। গৌরাঙ্গ হ'লে তাই নিয়ম।

"এবার দ্যাখো তো। এ জিনিসটি চিনতে পার?"

কালাচাঁদের চোখের সামনে স্যার ছাপা বইয়ের একখানা ছেঁড়া পাতা মেলে ধরলেন। এ হল গিয়ে সরল পাটিগণিতের একষট্টি আর বাষট্টি পৃষ্ঠা। হঠাৎ স্যার অর্ডার দিলেন, "সার্চ হিজ ব্যাগ।"

জ্ঞানেন্দ্র ছুটে গেল। ব্যাগ খুলতেই সুন্দর মলাট দেওয়া বইপত্র বেরিয়ে পড়ল। এদিকে কালাচাঁদ খুব পরিপাটি। খালি কাগজ দিয়ে প্রতিটি খাতা বই সুন্দর মলাট দেওয়া। তাতে শাদা কাগজের পটি আঠা দিয়ে আঁটা। কালাচাঁদের হাতের লেখা সুন্দর। গোট গোট করে লেখা: দিস বুক বিলংস টু শ্রীকালাচাঁদ প্রামাণিক। এ স্টুডেণ্ট অব প্রি-এস এফ ক্লাস।

স্যার পড়ে বললেন, "সেটা কোন্ ক্লাস সাধু কালাচাঁদ?"

"এখন কথা বলব স্যার?"

"পারমিশন দিলাম।"

"নাইন টেন তো স্কুল ফাইনালের ক্লাস। তাই তার আগের দু' ক্লাশের একটাতে আমরা পড়ি বলে স্যার—"

"ওঃ। তা ভাল। কীরে জ্ঞানেন্দ্র—পাটিগণিত পেলি?"

"এইতো স্যার—"

"দ্যাখতো একষট্টির পাতা—আছে কিনা পাতাটা—"

"নেই স্যার।"

"দেখি।" বলে অঙ্ক-স্যার মন দিয়ে বইখানা উল্টে পাল্টে দেখলেন। তারপর বই বন্ধ করে ভাল করে তাকালেন। "কী গৌরাঙ্গ, প্রি-এস এফ ক্লাসের স্টুডেণ্ট! স্কেল নিয়ে জলের ট্যাঙ্কে উঠেছিলে? তা বইয়ের পাতা সঙ্গে কেন?"

"এখন কথা বলব স্যার?"

"পারমিশন দিলাম।" বলেই স্যার স্কেল দিয়ে কালাচাঁদের হাঁটুতে সাঁই করে এক ঘা কষালেন।

গৌরাঙ্গ অবস্থায় কালাচাঁদ নির্বিকার চোখে বলল, "ওখানে মারবেন না স্যার।"

"কেন সাধু?"

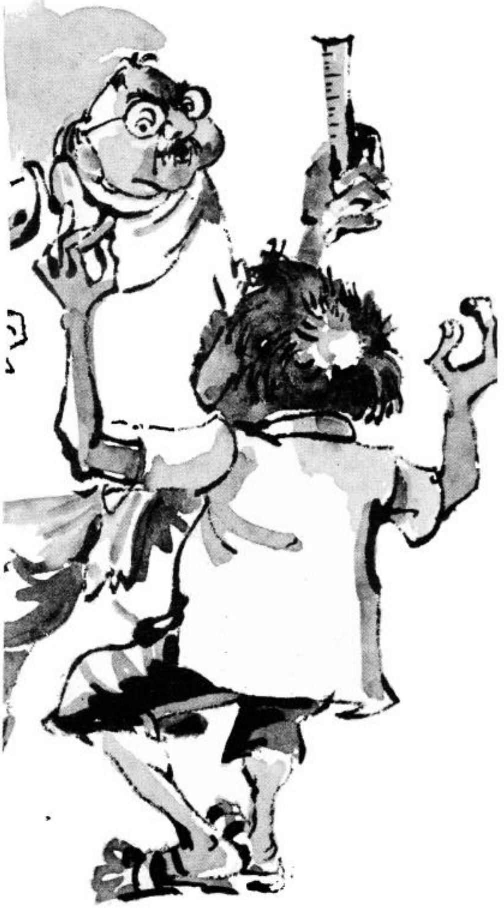

"একখানা ঘা আছে স্যার। কাঁচা ঘা। পিঠে মারুন।"

"ওখানে আবার কিছু নেই তো?"

"না স্যার। পরিষ্কার পিঠ।"

"তা এবার সব বলে ফেল সাধু কালাচাঁদ।"

"সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলব স্যার?"

না। যেমন আছো থাকো। অঙ্ক স্যার এখানে নেমে স্কেলখানা দিয়ে কালাচাঁদের পিঠে পর পর তিন ঘা দিলেন।

"আপনি বলেছিলেন আধ ঘণ্টায় কতটা জল ভরবে? তাই দেখতে গিয়েছিলাম। জলের ট্যাংকটাও তো একটা চৌবাচ্চা। না স্যার?"

অঙ্ক-স্যার এখানে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। "তাই বলে পাটিগণিতের পাতা ছিঁড়ে? স্কেল হাতে? জলের ট্যাংকের ছাদে? কখন উঠেছিলি?"

"সন্ধ্যের পর স্যার। আকাশে চাঁদ ছিল।"

"তাতো থাকবেই। তারপর?"

"অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। একা তো স্যার। সঙ্গে কাউকে পেলাম না। প্রথমে ছেড়া পাতাটা পড়ে এগোচ্ছিলাম। মভরু বাজারে যেতেই ট্যাংকের নিচের কল ছেড়ে দিলাম। পাঁচ মিনিটে সব জল বেরিয়ে গেল। ওপরের কল খুলে দিলাম। কিন্তু কোথায় জল। এমনি ফুট, ঘনফুট কিছুই চোখে দেখলাম না।"

"তখন?"

"ভয় পেয়ে গেলাম স্যার। তাতেই গণ্ডগোল হয়ে গেল সব। তখন অন্ধকারে পাটিগণিতের পাতা পড়তে পারছি না। মভরুও বাজার থেকে ফিরে আসছিল। তাই তাড়াতাড়ি নেমে এলাম।"

"ওই তো মুশকিল। নিচের কলটার মুখ তো বন্ধ করে তবে নেমে আসবি।"

"তাই তো করা হল না স্যার। হাতে কলমে অঙ্কটা শিখতে গিয়ে—"

"স্কুল সুদ্ধ হুলুস্থুলু বাধালি আজ। নে হাত পাত। তোর নিজের স্কেল। ভালোই লাগবে। কি বলিস।"

"হাজার হোক নিজের জিনিস তো স্যার। ভাঙবেন না কিন্তু।"

অঙ্ক স্যার থমকে গিয়ে বললেন, "কেন?"

"পাতলা কাঠের জিনিসতো স্যার। ভেঙে গেলে জোড়া যায় না আর।"

"তাই বুঝি।" স্যারের কথাও শেষ হল—আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি কালাচাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

কালাচাঁদ একটুও কাবু না হয়ে গৌরাঙ্গ অবস্থায় মিঠে হয়ে থাকবার চেষ্টা করে যেতে লাগল। শুধু একবার বলল, "তাই বলে নিজের মত করে অঙ্কটা শেখার চেষ্টা করব না স্যার?"

স্যার তখনো মারছিলেন। থেমে বললেন, "সারা স্কুলকে পিপাসায় রেখে অঙ্ক শেখা! একদম হাতে কলমে!"

এবার আর কালাচাঁদ কোন জবাব দিল না। তখন তার ওপর কিলচড় এসে পড়ছিল। স্কেলটা ভেঙে গেছে অনেকক্ষণ। পেট ফুলিয়ে ঢলঢলে হাফপ্যাণ্টটা প্রায় বুকের ওপর তুলে ফেলেছে। গৌরাঙ্গ অবস্থায় একদম সাধু হয়ে দাঁড়ালো কালাচাঁদ। নির্বিকার। চোখের পলকও পড়ছে না।

ছবি এঁকেছেন ॥ সুবোধ দাশগুপ্ত

বিন্দু বিসর্গ

ইন্দ্রমিত্র

শরৎচন্দ্র প্রথমবার ঢাকা গিয়েছেন ১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে।

দিনকয়েক ঢাকায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে থেকেছেন শরৎচন্দ্র।

চারুচন্দ্রের বাড়িতে তখন দুটি কুকুর—একটি দেশী, আরেকটি বিলিতী। দেশী কুকুরটার দিকে কারও কোনও নজর নেই, পাঁচজনের পাতে যা পড়ে থাকে, তা-ই তার জন্য বরাদ্দ। কিন্তু বিলিতী কুকুরটার খুব আদর-যত্ন, সময়মতো তাকে নাওয়ানো খাওয়ানোর নিপুণ ব্যবস্থা।

শরৎচন্দ্র যতদিন ঢাকায় চারুচন্দ্রের বাড়িতে থেকেছেন, প্রত্যহ খাওয়ার পর তিনি পাতের ভালো ভালো জিনিসগুলি নিয়ে নিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওই দেশী কুকুরটাকে খাইয়েছেন। দেশী কুকুরটার উপর তাঁর এত পক্ষপাতিত্ব কেন?

শরৎচন্দ্র উত্তর দিয়েছেন, "ওকে তো তোমরা কেউ দ্যাখো না—ওর উপর তোমাদের অযত্ন আর অবহেলা আছে বলেই আমি ওকে ভালোবাসি। বিলিতী কুকুরটাকে তো তোমরা যত্ন-আদর করছই। সে-আদরের উপর আবার আদর কেন?"

দেশী কুকুরটা খুব সবল আর তেজী; তার প্রতাপে বাড়ির বাগানের মধ্যে গরু-ছাগল সহজে ঢুকতে পারে না।

একদিন দুপুরবেলা। বাগানের উপরদিকের বারান্দায় শরৎচন্দ্র বসে আছেন। চারুচন্দ্রও আছেন কাছে।

হঠাৎ একটা গরু বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

দেশী কুকুরটা চিৎকার করতে আরম্ভ করল, তারপর ছুটে গিয়ে গরুটাকে কামড়ে দিল। গরুটি পালিয়ে গেল উর্ধ্বশ্বাসে।

দেশী কুকুরটা ফিরে এসে বারান্দায় উঠল। চারুচন্দ্র ওকে বললেন, "ভারী পাজী হয়েছিস।"

দেশী কুকুরটা কান গুটিয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

শরৎচন্দ্র ওকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বললেন, "চারু, তোমার ওকে বকা অত্যন্ত অন্যায়। ওই তো তোমার বাগানরক্ষকের কাজ করছে।"

চারুচন্দ্র বললেন, "কিন্তু ও যে গরুটাকে কামড়ে দিলে।"

শরৎচন্দ্র বললনে, "তা অন্যায়ই বা কী করেছে—কামড়ে একটু মাংস তুলে নেবার চেষ্টা করেছিল বই তো নয়।"

বাগানের মালী একদিন কী কারণে বিরক্ত হয়ে তার জল আনার বাঁক দিয়ে দেশী কুকুরটাকে এক ঘা মেরেছে। শরৎচন্দ্র দেখতে পেয়েছেন।

ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে আসবার সময়ে শরৎচন্দ্র ওই মালী বাদে বাড়ির সকল ভৃত্যকে বকশিশ দিয়েছেন। বলেছেন, "ওকে আমি এক পয়সাও দেব না। কুকুরকে যে মারে তার উপর আমার কোনও সহানুভূতি নেই।"

শরৎচন্দ্র দ্বিতীয়বার ঢাকা গিয়েছেন ১৯৩৬ সালে।

সেবার একটা সভায় যাওয়ার জন্য মোটরগাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন। উঠবার আগের মুহূর্তে শরৎচন্দ্র ড্রাইভারকে বললেন, "দ্যাখো, যদি রাস্তায় কুকুর চাপা দাও তো আমি গাড়ি থেকে নেমে যাব—সাবধানে চালিও।"

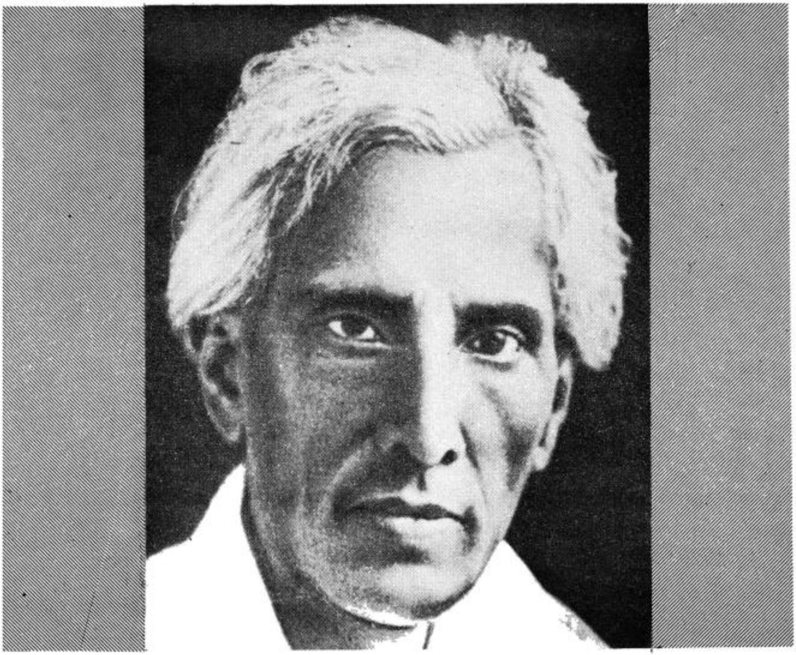

শরৎ কথামালা

অরবিন্দ গুহ

ছেলেবেলায় কতগুলি ফোঁড়া ও ঘা হয়ে মাথার চুল সব উঠে যায়, ঠাকুরমা তাই আদর করে নাম রেখেছেন—ন্যাড়া।

ন্যাড়ার ভালো নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্রের জন্ম ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। শরৎচন্দ্রের বাবার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মায়ের নাম ভুবনমোহিনী। ইনি হালিশহরের কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা।

অস্থির স্বভাবের মানুষ মতিলাল। কোনও কাজেই তিনি বেশীদিন লেগে থাকতে পারতেন না। তাঁর সংসারে খুব অভাব-অনটন।

ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাস নামে দুই পুত্রকে নিয়ে কেদারনাথ ভাগলপুরে বসবাস করেছেন। সময়ে সময়ে ভুবনমোহিনী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভাগলপুরে বাবার কাছে থেকেছেন।

শরৎচন্দ্রকে প্রথম ভর্তি করা হয়েছে দেবানন্দপুরে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায়। তারপর গ্রামে একটা নতুন বাঙলা স্কুল হয়েছে—সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের বাঙলা স্কুল। মতিলাল সেখানে ভর্তি করে দিয়েছেন শরৎচন্দ্রকে।

বিহারে একটা চাকরি পেলেন মতিলাল। স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের রেখে দিলেন ভাগলপুরে। ১৮৮৭ সালে শরৎচন্দ্র ভাগলপুর দুর্গাচরণ এম-ই স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তারপর ভর্তি হয়েছে ভাগলপুর জিলাস্কুলে।

কাজ ছেড়ে মতিলাল আবার সপরিবারে দেবানন্দপুরে ফিরে এলেন। ১৮৮৯ সালের কথা।

এবার শরৎচন্দ্রকে ভর্তি করা হল হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে। গ্রাম থেকে অনেক ছেলেই হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়তে

যেত। পাঁচ-ছজন ছেলের একটি দলের নেতা শরৎচন্দ্র। গ্রাম থেকে স্কুলে যেতে তিন মাইল কাঁচা রাস্তা পার হতে হয়। রাস্তাটি গ্রীষ্মকালে ধুলোয় আর বর্ষাকালে কাদায় ভর্তি থাকে।

শরৎচন্দ্র বড় দুরন্ত।

নিজের হাতে ছিপ বানিয়ে মাছ ধরে। বঁইচিফল পেড়ে এনে মালা গাঁথে। ঘুড়ির সুতো মাজে। ঘুড়ি বানায়। বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। গড়ের জংগলের মধ্যে নিজের হাতে মাটি কেটে বড় গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে; সেখানে বলতে গেলে একখানা ঘর তুলেছে; ঘরের মধ্যে মজুত আম-কাঁঠাল লিচু-আনারস কলাটলা—সব ফল গ্রামের বাগান থেকে গোপনে যোগাড় করেছে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গোপনেই সেসব ফল ভোগে লাগায়। অন্যের নৌকো—কখনও একা, কখনও বন্ধুদের সঙ্গে—খুলে নিয়ে নদীতে বেড়াতে যায় দু-তিন মাইল দূরে—কৃষ্ণপুরে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আখড়া অথবা সপ্তগ্রামের পুল পর্যন্ত। কৃষ্ণপুরের ওই আখড়া শরৎচন্দ্রের পছন্দমতো জায়গা। পায়ে হেঁটেও—একা অথবা বন্ধুদের সঙ্গে—সেখানে যায়।

দুরন্তপনার জন্য শরৎচন্দ্রকে গ্রামের কেউ কেউ অপছন্দ করেন।

কিন্তু কেবল দুরন্তপনাতেই শেষ নয়। শরৎচন্দ্রের স্বভাবে অন্য জিনিসও আছে। দরকার হলে কোনও রোগীর জন্য শরৎচন্দ্র গভীর রাত্রেও একা লাঠি আর লণ্ঠন হাতে নিয়ে তিন মাইল নির্জন রাস্তা হেঁটে শহর থেকে ওষুধ নিয়ে আসে, ডাক্তার ডেকে আনে। রাত জেগে রোগীর সেবা করে।

এই স্বভাবের জন্য গ্রামের অনেকের স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছে শরৎচন্দ্র।

গানবাজনার দিকে শরৎচন্দ্রের খুব টান। বাড়ি থেকে পালিয়ে একবার একটা যাত্রার দলে ঢুকে পড়েছে। অবশ্য সেখান থেকে তাকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে।

হ্যাঁ, দেবানন্দপুরেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যরচনার হাতেখড়ি হয়েছে।

মতিলালের দুরবস্থা এমন দারুণ যে কিছুকাল শরৎচন্দ্রের স্কুলের মাইনে পর্যন্ত তিনি দিতে পারেননি। কিছুদিনের জন্য শরৎচন্দ্রকে স্কুলে পড়াও বন্ধ করতে হয়েছে।

আবার সপরিবারে ভাগলপুরে এলেন মতিলাল। মামাবাড়ি থেকে শরৎচন্দ্র ভর্তি হল তেজনারায়ণ জুবিলী স্কুলে। ১৮৯৪ সালে সেকেন্ড ডিভিশনে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করল। তারপর ভর্তি হল তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে। কিন্তু এফ এ পরীক্ষা দেওয়া হয়নি টাকার অভাবে।

শরৎচন্দ্র, ১৯১৯ সালের ২৪ আগস্ট, লিখেছেন ঃ "বড় দরিদ্র ছিলাম—২০টি টাকার জন্য একজামিন দিতে পাইনি। এমন দিন গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান, আমার কিছুদিনের জন্যে জ্বর করে দাও তাহলে দুবেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, উপবাস করেই দিন কাটবে।"

কলেজের পড়াশোনায় ইস্তফা দেওয়ার আগেই—১৮৯৫ সালের নভেম্বরে—শরৎচন্দ্রের মা মারা গেছেন। তারপর মতিলাল শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে ভাগলপুরে আলাদা বাসা করেছেন খঞ্জরপুর মহল্লায়।

কিছুদিন রাজ-বানলী এস্টেটে চাকরি করেছেন শরৎচন্দ্র।

তারপর হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। সন্ন্যাসী-বেশে কিছুদিন এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করে শেষপর্যন্ত এলেন মজঃফরপুরে। আশ্রয় নিলেন ধর্মশালায়। সেখানে অনেকেই তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। তারপর প্রায় দু-মাস অতিথি হয়ে থেকেছেন শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। মহাদেব সাহু মজঃফরপুরের একজন জমিদার। গাইয়ে-বাজিয়ে হিসাবে শরৎচন্দ্র তাঁর সুনজরে পড়েছেন। আমন্ত্রিত হয়ে কিছুদিন কাটিয়েছেন মহাদেব সাহুর সঙ্গে।

হঠাৎ খবর পেলেন বাবা মারা গেছেন। মজঃফরপুর থেকে তাড়াতাড়ি চলে এলেন ভাগলপুরে। শ্রাদ্ধ করলেন। তারপর চলে গেলেন কলকাতায়। উঠলেন ভবানীপুরে লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসায়। লালমোহন সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মামা। ১৯০২ সালের কথা।

◆

ছ-সাত মাস কাটল। তারপর একদিন শরৎচন্দ্র বাড়ির কর্তাদের কিছু না জানিয়ে জাহাজে উঠে রেঙ্গুনে চললেন। ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসের কথা।

বর্মা যাওয়ার আগে কুন্তলীন-পুরস্কার প্রতিযোগিতায় 'মন্দির' নামে একটি গল্প দিয়ে গেছেন। কিন্তু লেখক হিসাবে নিজের নাম দেননি, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম দিয়েছেন। এখানে বলে রাখা ভালো, প্রতিযোগিতায় গল্পটি প্রথম হয়েছে। 'কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' পুস্তকে গল্পটি ছাপার অক্ষরে আছে। বলাবাহুল্য, সেখানে লেখকের নাম—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মামা।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মেসোমশাই। তিনি রেঙ্গুনে বিখ্যাত অ্যাডভোকেট। লুইস স্ট্রীটে তাঁর বাড়ি।

একদিন সকালবেলা। আটটা কি নটা বেজেছে। শরৎচন্দ্র ঢুকলেন অঘোরনাথের বাড়িতে। শরৎচন্দ্রের উস্কো চুল, ময়লা কাপড়, গায়ে একটা ছেঁড়া শার্ট, কাঁধে গামছা, পায়ে ঠনঠনের চটিজুতো।

রেঙ্গুনে অঘোরনাথের বাড়িতে আশ্রয় পেলেন শরৎচন্দ্র। গৃহশিক্ষক রেখে তাঁকে বর্মী ভাষা শেখাতে লাগলেন অঘোরনাথ। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা শরৎচন্দ্রকে উকিল করবেন। কিন্তু সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। অঘোরনাথ বর্মা রেলওয়ের এজেন্ট জন সাহেবের আপিসে তাকে একটা চাকরি যোগাড় করে দিলেন।

১৯০৫ সালের ৩০ জানুয়ারি অঘোরনাথ মারা গেলেন। অল্পদিন পরে অঘোরনাথের বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন শরৎচন্দ্র।

রেঙ্গুনে রেলওয়েতে পরে একটা চাকরি পেলেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু দু-তিনমাস বাদে এই চাকরিও ছাড়তে হল।

তারপর শরৎচন্দ্র কিছুদিন রেঙ্গুনে আশ্রয় নিয়েছেন মণীন্দ্রকুমার মিত্রের বাড়িতে। আবার চাকরি পেয়েছেন। এবার চাকরি জুটেছে ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের আপিসে।

শরৎচন্দ্র, ১৯১২ সালের ২২ মার্চ লিখেছেন ঃ "চাকরি করি। ৯০ টাকা মাহিনা পাই এবং দশ টাকা অ্যালাউন্স

পাই। একটা ছোটো দোকানও আছে।"

হ্যাঁ, চাকরি করতে করতে একটা দোকানও খুলেছেন শরৎচন্দ্র। চায়ের দোকান।

একদিন আপিসে এসে তিনি বন্ধুদের বললেন—আমি একটা চায়ের দোকান খুলেছি। দেখবে তো চলো। কথাটা কেউ বিশ্বাস করলেন না।

আপিস ছুটির পর তিনি দু-চারজন বন্ধুকে জোর করে নিয়ে গেলেন তাঁর নতুন চায়ের দোকানে।

একজন বন্ধু বললেন—তাহলে তো শরৎবাবুর চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। চায়ের দোকানে নিজে না বসলে দুদিনেই সাবাড় হয়ে যাবে।

শরৎচন্দ্র বললেন—না হে না, বসতে হবে না। জানো, আমি কি বন্দোবস্ত করেছি? একটিন দুধে কত চিনি মেশাতে হবে, তাতে কত পেয়ালা চা হবে, আমি সব ঠিক করে নিয়েছি। সকালবেলা দুধের টিন কিনে দেব, সারাদিন কত টিন দুধ খরচ হবে সন্ধ্যাবেলা হিসেব করলেই পয়সা ধরা পড়বে।

শরৎচন্দ্র তখন বোটাটং ল্যান্সডাউন স্ট্রীটে একটা দোতলা কাঠের বাড়িতে থাকেন। সেই লাইনে সবই কাঠের বাড়ি। সামনে প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠ থেকে নদী খুব দূরে নয়।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা রাস্তার শেষদিকে একটা কাঠের বাড়িতে আগুন লেগে গেল। ওই বাড়ি থেকে আট-দশটা বাড়ির পর শরৎচন্দ্রের বাড়ি।

ছোট্ট একটা কাঠের বাক্স আর দু-একখানা বই বগলে করে শরৎচন্দ্র বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। সব জিনিসপত্র ঘরে পড়ে রইল। একটি কুকুর ছিল, তাকে কোলে নিতে ভোলেননি।

কাছেই আলিমুল্লার বাজারের পাশে একখানা বাড়ি ভাড়া নিলেন। বারান্দা থেকে শরৎচন্দ্র দেখতে লাগলেন তাঁর অয়েলপেন্টিং, ঘরের সাজসরঞ্জাম, বইপুঁথি আগুনে পুড়ছে। আগুনের হাত থেকে আঁকবার সরঞ্জামগুলো শরৎচন্দ্র বাঁচাতে পেরেছেন।

রেঙ্গুনে একটি বামুনের মেয়েকে বিয়ে করেছেন শরৎচন্দ্র। নরেন্দ্র দেব লিখেছেন ঃ "শরৎচন্দ্র তাকে নিয়ে সুখীই হয়েছিলেন এবং তাঁদের একটি পুত্রসন্তানও হয়েছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্য তখন তাঁর পিছু-পিছু ফিরছিল। রেঙ্গুনে আবার দারুণ প্লেগের মহামারি দেখা দিলে—শরৎচন্দ্রের স্ত্রী পুত্র সেই প্লেগের আক্রমণে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল। শরৎচন্দ্র সেদিন বালকের ন্যায় কেঁদেছিলেন।"

শরৎচন্দ্রের এই স্ত্রীর নাম শান্তিদেবী।

প্রায় একযুগ বর্মায় কাটিয়েছেন শরৎচন্দ্র। অবশ্য এই দীর্ঘকালের মধ্যে মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে অল্পদিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন।

শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় চিঠিতে শরৎচন্দ্রকে কলকাতা যেতে লিখেছেন। কলকাতায় মাসে একশ টাকা আয়ের ভরসা দিয়েছেন।

১৯১৬ সালের মে মাসে বর্মা ছেড়ে কলকাতা চলে এলেন শরৎচন্দ্র। বাসা করলেন বাজেশিবপুরে। জীবনে আর কখনও বর্মা যাননি।

১৯২৫ সালে শরৎচন্দ্র পাণিত্রাস অঞ্চলে সামতাবেড় গ্রামে বাড়ি করেছেন।

পাণিত্রাস কেমন জায়গা?

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সামনে কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় একদিন শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন—পাণিত্রাস কীরকম জায়গা, এখানে ম্যালেরিয়া নেই?

শরৎচন্দ্র হাসতে লাগলেন। বললেন—উপীন, তুমি সে গল্প কাননকে করোনি? আমার এক ভগ্নীপতি আছেন, তাঁর বয়েস প্রায় সত্তর। তাঁকে পাণিত্রাসের স্বাস্থ্যের কথা কেউ জিগগেস করলে জবাব দেন, আর কেন বলেন মশাই, এই বুড়ো বয়সেও খোলা জায়গায় নিশ্চিন্তে একটু তামাক খেতে পাই না।

কিন্তু তাতে কী হল? কাননবিহারী ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না।

উপেন্দ্রনাথ তখন ব্যাখ্যা করে বললেন—পাড়াগাঁয়ে গুরুজনদের সামনে তামাক খেতে নেই। শরতের ভগ্নীপতির চেয়েও বড় এত বুড়ো এখানে আছেন যে তাঁর তামাক খাওয়ার নিয়ত ব্যাঘাত হয়—এমন ভালো স্বাস্থ্য এখানকার।

গ্রামের চাষাভুষোদের নিতান্ত আপনজন হয়ে থেকেছেন শরৎচন্দ্র। তারা জানে না তাদের দাদাঠাকুরের আলাদা কোনও অস্তিত্ব আছে। মনোজ বসু লিখেছেন ঃ "হাসিমুখে শরৎচন্দ্র বললেন—একদিন কিন্তু সত্য সত্য আমার বড় দুঃখ হয়েছিল! একখানা টেলিগ্রাম এসেছে, সেটা পড়বার জন্য ছুটোছুটি পড়ে গেছে। এমন কি মাইল দেড়েক গিয়ে ভিন্ন গ্রাম থেকে পড়িয়ে আনবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি সেইখানটায় বসে। অথচ এতগুলোর মধ্যে একটা লোকেরও মনে এ কথাটা জাগল না যে টেলিগ্রাম পড়বার মতো ইংরেজি বিদ্যা দাদাঠাকুরের থাকলেও থাকতে পারে।"

১৯৩৪ সালে বালিগঞ্জে একখানা বাড়ি করেছেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু বালিগঞ্জে তাঁর মন টিঁকত না। সামতাবেড় যাওয়ার জন্য ছটফট করতেন। সুযোগ পেলেই সামতাবেড়ে চলে যেতেন। গেলে আর সহজে বালিগঞ্জে আসতে চাইতেন না।

একখানা মোটরগাড়ি কিনেছেন শরৎচন্দ্র। একজন ড্রাইভার বহাল করেছেন। ড্রাইভারের নাম কালী। শরৎচন্দ্র প্রথম দিনই কালীকে বলেছেন—আমি যতদিন বাঁচব, কালী, তোমার কোনও অভাব রাখব না। কিন্তু একটি কথা তোমাকে বলে রাখি। যেদিন তুমি গাড়ি চালাতে গিয়ে পথে কোনও মানুষ কেন একটা কুকুর, বিড়াল বা হাঁস-মুরগীও চাপা দেবে সেদিন তক্ষুনি তোমার চাকরি যাবে। আমার এই কথাটি মনে রেখো।

◆

১৩১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে 'ভারতী' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়েছে। তার আগে কোথাও স্বনামে শরৎচন্দ্রের কোনও রচনা ছাপার অক্ষরে দেখা যায়নি।

শরৎচন্দ্র বিস্তর বই লিখেছেন। বিপুল খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেছেন। বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক রম্যাঁ রলাঁর মতে শরৎচন্দ্র একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে জগত্তারিণী মেডেল দিয়েছে। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরৎচন্দ্র 'ডি লিট' উপাধি পেয়েছেন ১৯৩৬ সালে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ঃ "যাতে ঢাকা বিশ্ব-

বিদ্যালয় থেকে শরৎবাবুকে একটা 'অনারারী ডিগ্রী—ডি লিট দেওয়া হয় আমি সেজন্য চেষ্টা করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এইরূপ সম্মান দিলেই সেটা সুশোভন হত, কিন্তু তা যখন হোল না তখন অন্তত বাংলার একটা বিশ্ববিদ্যালয় যাতে তাঁর গুণের উপযুক্ত সম্মান করে সেইজন্যই আমি এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলাম।...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এই প্রস্তাব গ্রহণ কর্লেন...।"

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। শরৎচন্দ্র সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একদিন বললেন—শরৎবাবু, আপনি স্বরাজ্য পার্টির পক্ষে হাওড়া জেলা থেকে অ্যাসেম্ব্লিতে দাঁড়ান।

শরৎচন্দ্র রাজি হলেন না। বললেন—আমি গরীব সাহিত্যিক, লিখে খাই। আমাকে এ-রকমভাবে মারবেন না।

দেশবন্ধু হেসে বললেন—মারছি কোথায়? আপনি অ্যাসেম্ব্লিতে ঢুকলেই মন্ত্রী হবেন। আরও ভালো করে লিখতে পারবেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—রক্ষে করুন। এ-রকম ভাবে যদি আমার উপর অত্যাচার করেন তাহলে আমি সমস্ত ছেড়ে দিয়ে একদিকে পালিয়ে যাব।

দেশবন্ধু বললেন—আপনার অ্যাসেম্ব্লিতে দাঁড়িয়ে দরকার নেই। আর পালাতে হবে না।

রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যে শরৎচন্দ্র বড় সাধক। রবীন্দ্রনাথ, ১৯২৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি, শরৎচন্দ্রকে লিখেছেন ঃ "তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এ দেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত।" রবীন্দ্রনাথ, ১৯২৮ সালের ১১ মার্চ, শরৎচন্দ্রকে লিখেছেন ঃ "আমি তোমার যে সব গল্প পড়েছি তাতে তুমি অতি অনায়াসে চিরকালের সত্যকে মূর্তি দিয়েচ—"

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রাগের মাথায় কখনও কখনও মন্দ কথা বলেছেন বটে শরৎচন্দ্র, কিন্তু সেটাই আসল কথা নয়। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের মস্ত ভক্ত তিনি, রবীন্দ্রনাথকে তিনি গুরু বলে মেনেছেন। শরৎচন্দ্র, ১৯৩২ সালের ১৩ জানুয়ারি লিখেছেন ঃ "কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়, এ যেমনি সত্যি—এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই,—আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানেনি গুরু বলে,—আমার চাইতে কেউ বেশী মক্‌সো করেনি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশী বার কেউ পড়েনি তাঁর উপন্যাস,—তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা পড়ে ভাল বলে, সে তাঁরি জন্যে। এ সত্য, পরম সত্য, আমি জানি।"

শরৎচন্দ্র বেশীদিন জীবিত থাকেননি। তিনি, ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি, ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বিস্তর কথা ও কাহিনী চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। কিছু কথা ও কাহিনী শুনে রাখা ভালো।

হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন ঃ 'জীবজন্তুর প্রতি শরৎচন্দ্রের প্রাণের টান ছিল চিরদিনই। খুব ছেলেবেলাতেও তিনি বাক্সে করে নানারকম ফড়িং পুষতেন, পরিচর্যা করতেন নিজের হাতে। কোন বাড়ির উঁচু আলিসা দিয়ে একটা মালিকহীন বিড়ালকে চলা-ফেরা করতে দেখলে তিনি দুর্ভাবনায় পড়তেন,—যদি সে পড়ে যায়! পাখী, ছাগল ও বানর প্রভৃতি সব জীবকেই তিনি সমান যত্নাদর বিলিয়ে গেছেন। তাঁর পোষা দেশী কুকুর 'ভেলু' তো প্রায় অমর হয়ে উঠেছে। 'যুবরাজ', 'বংশীবদন' প্রভৃতি আদরের ডাকে তিনি তাকে ডাকতেন।"

◆

'বেটু' একটা টিয়াপাখির নাম। শরৎচন্দ্রের আদরের টিয়াপাখি।

বাড়ির উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। আষাঢ় কি শ্রাবণ মাস, শৈলেশ বিশী একদিন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়েছেন, চোখে পড়ল পাকা পেয়ারায় গাছ ভর্তি।

লোভ সামলাতে না পেরে শৈলেশ দুটি পেয়ারা পেড়ে নিলেন। একটি রাখলেন পকেটে। আরেকটি খেতে আরম্ভ করে দিলেন।

শৈলেশকে পেয়ারা খেতে দেখে শরৎচন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চাকরকে গম্ভীরভাবে বললেন—সব পেয়ারা পেড়ে ফেলো।

পেয়ারা পাড়া হয়ে গেল।

শরৎচন্দ্র তখন হুকুম দিলেন—সব পেয়ারা পাড়ায় বিলিয়ে দাও।

শৈলেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে।

শরৎচন্দ্র বললেন—তুমি না বলে কেন পেয়ারা পাড়লে, না হয় সব পেয়ারা তুমিই নিয়ে যাও।

শৈলেশ বললেন—এ-রকম অবিচার আমার উপর কেন করছেন, আমার যে কী অপরাধ তা তো বুঝতে পারলাম না।

শরৎচন্দ্র বললেন—তাহলে এসো, দেখবে এসো।

ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন শৈলেশকে। দেখা গেল তাকের উপর চার-পাঁচটা ছোট ছোট কাঁসার বাটি। বাটিতে বাটিতে সাজানো আছে বেদানার দানা, আনারসের টুকরো, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস।

শরৎচন্দ্র বললেন—এসব বেটুর খাবার। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেটু এসব খায়। বেটুর খাবার আগে এ-বাড়ির ফল কেউ খেতে পারে না। তুমি যখন তার আগে ফল খেয়েছ তখন এগুলো পাড়ায় সব বিলিয়ে দিকগে।

কথা শুনে শৈলেশ আধ-খাওয়া পেয়ারা আর পকেটের আস্ত পেয়ারা জানালা গলিয়ে ফেলে দিলেন।

শরৎচন্দ্র বেটুর কাছে গিয়ে 'বাবা বেটু! বাবা বেটু!' বলে গায়ে হাত বুলিয়ে, ঠোঁটে চুমু খেয়ে, মাথাটি গালের সঙ্গে ঠেকিয়ে আদর করে তাকে আস্তে আস্তে সব ফল খাওয়ালেন।

সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে তিনটি গরু ছিল। একে একে তিনটি গরুই দুধ দেওয়া বন্ধ করল। অনেকে তখন পরামর্শ দিলেন—বসিয়ে খাওয়াচ্ছ কেন, গরু-

---

'ভুল শুধরে নাও। ভাদ্র-সংখ্যায় 'বাসুকি যখন নড়েন' রচনাটিতে ছাপা হয়েছে, পর্তুগালে ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। আসলে কিন্তু ওটা ১৭৫৫ সালের ঘটনা।

গুলোকে বিদেয় করো।

শরৎচন্দ্র কান দিলেন না সেই পরামর্শে। বললেন—ওদের কাছে অকৃতজ্ঞ হতে পারব না।

কিছু জিনিসপত্র কেনা দরকার। শরৎচন্দ্র চললেন গড়িয়াহাট বাজারের দিকে। সঙ্গে নরেন্দ্র দেব আছেন।

শীতকাল। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে ছাতা আছে। একটা ছাতার তলায় দুজনে যাচ্ছেন।

গড়িয়াহাটার মোড়ের কাছে একজন বুড়ী হাত পেতে দাঁড়াল।

পরনে ছেঁড়া কাপড়। বৃষ্টিতে ভিজে গায়ে লেপটে আছে। শীতে বুড়ী কাঁপছে।

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করে ভেতরে যা ছিল—পনেরো-কুড়ি টাকা তো হবেই—শরৎচন্দ্র উপুড় করে বুড়ীর হাতে ঢেলে দিলেন।

বুড়ী অবাক হয়ে গেল।

শরৎচন্দ্র বললেন—মা, এ-টাকায় তোমার যে-কদিন চলে সে-কদিন আর ভিক্ষায় বেরিও না। একে শীত, তাতে বৃষ্টি নেমেছে, ঠান্ডায় তুমি কাঁপছ। দ্যাখো, আমি রোজ এদিকে বেড়াতে আসি। টাকাকড়ি ফুরিয়ে গেলে আবার তুমি এসে দাঁড়িও এই মোড়ে, আমি আবার কিছু দেব। আজ আমার সঙ্গে এর বেশী আর কিছু নেই।

সিনেমায় শরৎচন্দ্রের প্রথম বই 'আঁধারে আলো' দেখানো হচ্ছে মনোমোহন থিয়েটারে।

ঢালা বিছানা পাতা বক্সে বসে শরৎচন্দ্র আঁধারে আলো দেখছেন। সঙ্গে আছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও হেমেন্দ্রকুমার রায়।

সিনেমা শেষ হল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের একপাটি তালতলার চটি কোথায় গেল?

বিস্তর খোঁজাখুঁজি হল। কিন্তু চটির একপাটি পাওয়া গেল না।

হতাশ হয়ে শরৎচন্দ্র চটির অন্য পাটি বগলদাবা করে উঠে দাঁড়ালেন।

হেমেন্দ্রকুমার বলেন—আর একপাটি চটি নিয়ে কী করবেন, ওটাও এখানে রেখে যান।

শরৎচন্দ্র বললেন—ক্ষেপেছ? চোর ব্যাটা এইখানেই কোথায় লুকিয়ে বসে সব দেখছে। আমি এ-পাটি রেখে গেলেই সে এসে তুলে নেবে। তার সে-সাধে আমি বাদ সাধব,—শিবপুরে যাবার পথে হাওড়ার পুল থেকে চটির এই পাটি গঙ্গাজলে বিসর্জন দেব।

খালি পায়েই শরৎচন্দ্র গিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

পরদিনই বক্সের তলা থেকে তালতলার হারানো চটির পাটি পাওয়া গেল।

এই কাহিনীটি নিবেদন করে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন : "কিন্তু শরৎচন্দ্রের হস্তগত অন্য পাটি তখন গঙ্গালাভ করেছে এবং সম্ভবত এখনো সলিল-সমাধির মধ্যেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।"

মণিমেলার খবর

কর্মী শিক্ষণ : সংগঠনের স্থায়িত্ব, উৎকর্ষ ও প্রসারের জন্য শিক্ষিত কর্মী-দল অপরিহার্য। উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একজন স্বেচ্ছাব্রতী কর্মী নিজের প্রতিষ্ঠানকে আরও সুচারুরূপে সেবা করতে পারেন, এবং সমগ্র সংগঠনকে মজবুত করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। এইজন্য মণিমেলা মহাকেন্দ্র কলকাতা ও শহরতলির মণিমেলাগুলির কর্মীদের জন্য এক দশদিনব্যাপী শিক্ষণ-কেন্দ্রের আয়োজন করেছিলেন। শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা নিজ নিজ অঞ্চলে আঞ্চলিক ট্রেনিংয়ের দায়িত্ব নেবেন। শারীর-শিক্ষণে কৃতী ও অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা এই শিক্ষণ-কেন্দ্রে শিক্ষা দেন। এর পর পর্যায়ক্রমে বর্ধমান, কৃষ্ণনগর ও উত্তর বাংলায় কর্মী-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আর্থিক অনুদান : নিজেদের সীমিত আর্থিক সামর্থ্য সত্ত্বেও মণিমেলা মহাকেন্দ্র গত বছর থেকে নিয়মিত শাখাকেন্দ্রগুলিকে কিছু আর্থিক সাহায্য দিতে শুরু করেছে। সুখের কথা, কেন্দ্রীয় অর্থকোষকে পুষ্ট করতে অধিকাংশ মণিমেলাই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে এসেছে, আর তাই এইভাবে সংগৃহীত অতিরিক্ত অর্থের সিংহভাগ মণিমেলাগুলিকে তাদের সারা বছরের শিশু-কল্যাণ কাজের জন্য অনুদান হিসেবে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বর্তমান বছরে (১৯৭৫-৭৬) বিভিন্ন মণিমেলাকে মোট ৪,৩৬৩ টাকা আর্থিক অনুদান হিসাবে মণিমেলা মহাকেন্দ্র মঞ্জুর করেছেন।

বার্ষিক কর্মসূচী : কেন্দ্রপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মণিরক্ষক ও আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের এক সভায় ১৯৭৫-৭৬ সালের জন্য নিম্নরূপ বার্ষিক কর্মসূচী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

জুলাই—সেপটেমবর (শনিবার, রবিবার ও ছুটির দিন) : মণি-প্রতীক পরীক্ষা; সেপটেমবর ১৩—২১ : আঞ্চলিক কর্মী-শিক্ষণ শিবির; অকটোবর ৭ : লাকি-কুপন ড্র; অকটোবর ২৬ : কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতা।

ডিসেম্বর ২৩—৩১ : বার্ষিক শিক্ষণ শিবির; জানুয়ারি ১০—১১ : ক্রীড়া প্রতিযোগিতা; জানুয়ারি ২২—২৫ : প্রদর্শনী; জানুয়ারি ২৫ : মুক্তাঙ্গন অঙ্কন প্রতিযোগিতা; জানুয়ারি ২৬ : আঞ্চলিক মণি-সমাবেশ; ফেব্রুয়ারি ২২ : সমাবর্তন মার্চ ১০ : মণিমেলা পতাকা দিবস।

নতুন মণিমেলা : মণিমেলার বহুমুখী শিশুকল্যাণ-কার্যক্রম বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন শাখাকেন্দ্র গড়ে তুলতে স্থানীয় অভিভাবক ও শিশুকল্যাণ-কর্মীদের অনুপ্রাণিত করছে। মণিমেলা গড়ার নিয়মকানুন জানতে চেয়ে অজস্র চিঠি অথবা টেলিফোন আসছে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, ব্লক-২, রুম-৫, কলকাতা-২৯-তে মণিমেলা মহাকেন্দ্রের অনুমতি-প্রাপ্ত নিয়মিত শাখাকেন্দ্র ছাড়া কোনও সংস্থার পক্ষে মণিমেলা নাম ব্যবহার করা বেআইনী। সম্প্রতি কেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে নীচের মণিমেলাগুলি কাজ শুরু করেছে। আমরা এদের সকলের অগ্রগতি কামনা করি। **শুভ্রসাথী** (ধানবাদ), **আজাদ হিন্দ** (বারুইপুর), **অভ্যুদয়** (কলকাতা), **আনন্দময়ী** (কৃষ্ণনগর), **নির্ভীক** (হাওড়া), **অগ্নিকণা** (মুর্শিদাবাদ), **শুচিশুভ্র** (কৃষ্ণনগর), **ঋষি অরবিন্দ** (বেহালা), **সিদ্ধার্থ** (বর্ধমান), **সোনারতরী** (বর্ধমান), **বজবজ** (বজবজ), **চৈতালী** (বর্ধমান), **অভেদানন্দ** (রহড়া), **পল্লীমঙ্গল** (হাওড়া), **দক্ষিণ বারাসত** (২৪ পরগনা), **খেয়া** (বর্ধমান)।

স্ট্রাইকার

ময়দানের ফুটবল

ফুটবলের মাঠে প্রবীণরা সেদিন প্রমাণ দিলেন যে, নবীনদের উপরে আজও তাঁরা টেক্কা দেন। বাঁয়ে পি-কে ও পরিমল; মাঝখানে চুনি; ডাইনে বল কাড়ছেন বলরাম।

শ্যাম থাপা আর কাজল মুখার্জী নিচু গলায় গুলতানি জুড়েছে টেনটের বাইরে। ওদের কান কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল টেনটের দিকে। কোচ প্রদীপ ব্যানার্জি পরিত্রাহি চিৎকার করেছেন। প্লেয়াররা তাঁর কথাগুলি সাগ্রহে শুনছে। পি কে'র কথা কালকা মেলের মতো ছুটছে, "এ সিজনে তোদের খেলা দেখে আমি অবাক। তোদের কী যে হয়েছে বুঝি না। ডিফেন্স আর কত বল জোগাবে? এক সময় ওদেরও বিরক্তি ধরে। বল জুগিয়েও ক্রমাগত গোল করতে না পারলে এমন হবেই। গত কয়েক বছরের দাপট এবার এতোটুকু হয়েছে। একবার পালে বাঘ পড়ুক, বুঝতে পারবে ঠেলাটা।"

আসলে পি কে তাঁর গনগনে কথার আঁচে তাতিয়ে তুলছিলেন ইস্টবেঙ্গলের ফরোয়ার্ড– বাহিনীকে, ঠিক তার পরের দিনই খেলা ছিল পোর্ট কমিশনার্সের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের।

এবারের প্রথম ডিভিশন লীগের শুরু থেকেই বাড়তি টান ছিল। এর আগের কয়েক বছরে মহমেডান টিম হালে পানি পায়নি। ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান নিয়েই যত হইচই। সেই আট বছর আগের মত মহমেডান গত কয়েক বছরে চ্যালেঞ্জ ছোঁড়েনি। ১৯৩৪-৩৮, উপর্যুপরি পাঁচ বছর লীগ পাওয়ার রেকর্ড পেরিয়ে ইস্টবেঙ্গল নতুন দৃষ্টান্ত গড়তে চলেছিল। এতে মহমেডানের ইজ্জত নিয়েই যত টাগ-অব-ওয়ার। ওরা রুখে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আবার থমকে গেছে মোহনবাগানের কাছে ১-৩ গোলে হেরে। লড়াইটাও তিনমুখো হয়েছে। লীগে প্রত্যেক ক্লাবেরই নজর থাকে ম্যাচের পর ম্যাচ খেলে টিমের দোষ-টোষ মেরামত করে টিমটাকে ভালভাবে দাঁড় করানোর দিকে। আই এফ এ শীল্ড ইস্টবেঙ্গল পর পর চার বছর পায় কি না সেটাও বিশেষ আকর্ষণ।

খেলার গুণে সারা লীগে তিন নিকট প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছাকাছি ঘুরঘুর করছে এরিয়ান ক্লাব। আর তারই গা-ঘেঁষে খিদিরপুর, বি এন আর, ইস্টার্ন রেল টিমগুলি লীগ টেবলে মাঝবরাবর জায়গা পেতে চেষ্টা করছে। বাকীটুকু নীচের দিকের ক্লাবের হাঁকপাকানি। কে নামবে, কে নামবে না, তার জল্পনা। আফশোস থেকেছে নীচের তলার একটি টিম নিয়ে। ওরা বালি প্রতিভা দল।

কলকাতা তখন বিশ্ব টেবল টেনিস নিয়ে ব্যস্ত। হাবিব-আকবর ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে মহমেডানে খেলার জন্য সই করল ঘেরাটোপ-গাড়িতে আই এফ এ দফতরে গিয়ে। কলকাতা-৭৫ ফুটবল মরশুম ওইখানেই বড় মোড় নিল। বহু প্লেয়ারের ক্লাব ছাড়াছাড়ির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু হাবিব-আকবরের ক্লাব ছাড়ার ঘটনার তুলনা মেলা ভার।

মাথা ভরতি ঝুপসি চুলের নেপালী ছেলে রুক বাহাদুর ইস্টবেঙ্গলে এল। সে জবর খবর। মেড ইন হংকং, মেড ইন হংকং। কয়েকদিনেই ময়দানে লীগ মরশুমের শুরুতেই দেখা যায়—রুক বাহাদুর যত বড় না খেলোয়াড়, তার চেয়ে রটনা হয়েছে বেশী। কলকাতার মাঠে ঘাস চিনতে তার ঢের সময় লাগবে। হাফ মরসুম যেতে না যেতেই সে কলকাতা থেকে হাওয়া, সপ্তাহখানেকের ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিল।

লীগের শুরুতে তিন বড় ক্লাব নিয়ে চারিদিকে নানান রটনা হয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের সমস্যা, হাবিব-

আকবররা ফরোয়ার্ড লাইনে কেমন খেলবে। পি কে'র সমস্যা ছিল—ঝুনো-কচি ফুটবলার মিলিয়ে ফরোয়ার্ড লাইন কীভাবে দাঁড় করানো যায়। সমাধান হিসাবে ঝুনো প্লেয়ারদেরই আগে চান্স দেওয়া হয়েছে। পি কে'র কথা "এর আগে লীগ সিজনের শুরুতে ইস্টবেঙ্গল টিম শতকরা ষাটভাগ ফিটনেসের অনুশীলনে গড়ে তুলেছি। এবার সেটা আরও বাড়ানো হয়েছে।" পি কে এবার ইস্টবেঙ্গল টিম নিয়ে অমানুষিক খেটেছেন। এর মধ্যে প্রথম ডিভিশন লীগে নবাগত টিম চন্দ্র মেমোরিয়ালকেও পি কে'র উপদেশ-নির্দেশ দেওয়ার বাড়তি দায়িত্ব ছিল। এক মাসের তফাতে লীগের শুরুতে ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ড লাইনে নতুনদের দাপট বেড়েছে।

মহমেডান টিম গড়েছে ভারতের চোখা ফুটবলারদের নিয়ে। তাদের কোচটিও সুখ্যাত—মহম্মদ হোসেন। শারীরিক অসুস্থতায় তাঁর পক্ষে শুরুতে সপ্তাহখানেকের বেশী মহমেডান প্লেয়ারদের নিয়ে নাড়াচাড়া করা সম্ভব হয়নি। তবু কিছুদিনের ওই অনুশীলনেই মহম্মদ হোসেন লীগ সিজনে মহমেডানের সম্ভাবনার আভাস দেন। মহমেডান অন্য কয়েকবছরের মত এবার আর দুর্বল টিম নয়, তারাও ময়দানে যে কোন টিমকে একচোট দেখে নিতে প্রস্তুত ছিল। মাঠে জল পড়লে প্লেয়াররা যদি মানিয়ে নিতে পারে, তবে লীগে মহমেডানের খেলার জলুস বাড়বে। নইলে নয়। ইডেনে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে মহমেডানের খেলায় কথাটা দগদগে সত্যি হয়ে দাঁড়াল। হায় হাবিব, হায় আকবর। ইস্টবেঙ্গল থেকে ছেড়ে আসার সার্থকতা তেমন ফলল না। সেই ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান ম্যাচটাই সিজনের গুরুত্বপূর্ণ খেলা হয়ে দাঁড়াল। ওই খেলার আগেই এই লেখা।

মহম্মদ হোসেনের অভাবে টিমের ভার নায়িমহাবিবের উপর ছিল। নায়িমকে মহমেডান ভক্তরা ডাকে 'বড়ে মিঞা' নামে। হাবিব ছোটে মিঞা। দুই মিঞা সাহেব, আকবর, লতিফুদ্দিন, নটরাজ মিলে মহমেডানের টিমে লড়ার কষটা জোরদার করে তুলছে। গোলকীপারের খুঁটিটাই ওদের কেমন যেন নড়বড়ে। সামনের দিকে লতিফুদ্দিনের খেলা তার অতিবড় নিন্দুককে চমকে দিয়েছে।

গত বছর ডুরান্ড সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল হেরেছিল মোহনবাগানের কাছে, মাত্র একগোলের তফাত। ওই খেলার ফলটাই মোহনবাগান ফুটবল কর্তৃপক্ষের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। তাঁদের ধারণা ডুরান্ডের টিম রাখলেই চলবে। তাই টিমের বড় দরের প্লেয়ার হিসাবে নেওয়া হল জহর দাস আর শিবব্রত নাথকে। সেই ইস্টবেঙ্গল—মোহনবাগানের ডুরান্ড ম্যাচটা যারা দেখেছে তাদের রায়—মোহনবাগান সে ম্যাচে গন্ডাখানেক গোলে হারলেও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। একটা সামান্য ব্যাপার—সে ম্যাচে মোহনবাগানের গোলটা উলগার নামে রটলেও আসলে স্কোরার ছিল প্রসূন ব্যানার্জি।

এবারও মরশুমের শুরুতে মোহনবাগান গ্যালারিতে প্লেয়ারদের নিয়ে সমানে টিটকারি চলেছে। '৭৪ লীগ সিজনে মোহনবাগান ফরোয়ার্ডরা গোল করতে গিয়ে যেসব মারাত্মক ভুল করত, এবারও তার বিশেষ সংশোধন হয়নি। ব্যাক আর লিঙ্কম্যানরা ক্রমাগত নড়বড়ে খেলা খেলেছে। উলগা সিজনের শুরুতে ভাল খেললেও ওর বল পায়ে রাখার বদ অভ্যাস যায়নি। বল নিয়ে কিরকম কেরামতি দেখালে হাততালি পাওয়া যায়—উলগা খেলার সময় সেটাই যেন খোঁজে।

মোহনবাগান টিমের খেলা দেখে অনবরত মনে হয়েছে, কোচ থাকা সত্ত্বেও বছর কয়েক ধরে একই ভুলের জন্য মোহনবাগান টিম বারবার হুঁচট খাচ্ছে। প্লেয়াররা প্রতিটি ম্যাচে একই ভুল বারবার করছে! ব্যাপারটা কী—হয় কোচ প্লেয়ারদের খুঁত ধরতে পারছেন না, নয় কোচের পরিকল্পনা প্লেয়াররা ঠাহর করতে পারছে না। এ গরমিল কবে শোধরাবে? ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে জহর দাসকে খেলালে মোহনবাগানকে ঠকতে হত না। ভুলটা

মোহনবাগান-মহমেডান খেলায় (০—১) জহর দাস গোল করবার পরের দৃশ্য। সামনে হাত তুলে শিশির গুহমজুমদার।

ইস্টবেঙ্গল-এরিয়ান খেলায় (৩—১) রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় গোলে বল ঠেলেছে।

কার?

ভুলের মাশুল দিতে দিতে মোহনবাগান টিম এবার ইডেনে একতালে পাল্লা দিয়েও এক গোল খেয়ে টেনেটে ফিরল। ফরোয়ার্ডরা ওই বিগ ম্যাচের আগে গোল করার ব্যাপারে সাধারণ খেলাগুলিতে বিদঘুটে-রকমের ভুল করেছে। মনে হল, ইস্টবেঙ্গল গোলের মুখেও তারা সেই ভুলগুলোরই পুনরাবৃত্তি করল। ডিফেনসেও সেই একই হাল। সুভাষের উপর বেশী নজর দেওয়ায় শ্যাম ফাঁকায় পড়েছে এবং একলার চেষ্টায় গোল করেছে। শ্যামের পক্ষে দ্বিতীয়বার ওই ভেল্কি দেখানো কি সম্ভব?

ইডেনের ওই খেলা নিয়ে মোহনবাগান-ভক্তদের সান্ত্বনা—ওই ম্যাচে মোহনবাগান কিছুটা ভয়ের কোটর থেকে বেরিয়ে বুক চিতিয়ে লড়েছে। সাবাশ। মহমেডানের বিরুদ্ধে মোহনবাগান সেই বাহবা আবার পেয়েছে।

কিন্তু ওরা ওই আহ্লাদ নিয়েই অনবরত লোফালুফি খেলেছে অথচ ভুলে মেরেছে ১৯৪৯ লীগের সেই খানদানী রেকর্ডটা। ইস্টবেঙ্গল সেবার পায় লীগ, শীল্ড ও রোভার্স। ভেঙ্কটেশ, ধনরাজ, আমেদ, সালে ও আপ্পারাও—পাঁচটি হীরের টুকরো ফুটবলার ছিল সেবার ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ড লাইনে। তাতেও লীগে দুবারই মোহনবাগানের কাছে ইস্টবেঙ্গলের মাথা হেঁট হয়। প্রথমবার ১—০, দ্বিতীয়বার ২—১। দুটি ম্যাচে আমেদ খাঁ মাত্র একটিবার মোহনবাগান গোলে বল ঢুকিয়েছিল।

উপর্যুপরি পাঁচ বছর লীগ পাওয়া কট্টর ইস্টবেঙ্গল ভক্তের মনেও বারই জুলাইয়ের ম্যাচটা তেমন দাগ কাটেনি। পি কে'রও সেই কথা। "ওই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের খেলা আদৌ আমায় খুশী করতে পারেনি।"

ময়দানে যাঁরা ভিড় জমান, তাঁদের অধিকাংশই কোনো না কোনো ক্লাবের সমর্থক। ক্লাবের হার-জিতের দিকে নজর সবারই রয়েছে। তবে একটা ব্যাপারে সকলেই একমত। সেটা এই যে, ময়দানের ফুটবলে তেমন চটক আর নেই। এমন কী, মোহনবাগান — ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচেও না। তাই ওই বিগ ম্যাচ দেখেও দর্শকদের মন ভরেনি। এছাড়া তিন জবরদস্ত টিমের সঙ্গেও দিনের পর দিন কমজোরী টিমগুলো সেই একঘেঁয়ে খেলা খেলে চলেছে। দেখা গেছে, প্রতিটি টিম হাফ-টাইম পর্যন্ত কোনোরকম ঠ্যাকা দিয়ে চলেছে। ওইরকম প্রায় খেলাতেই বড় টিম পঞ্চাশ বা ষাট মিনিট খেলা চলার পর হাফ-টাইমের আগের সেই দুর্ধর্ষ টিমকে বশ মানিয়েছে। কমজোরী টিমের প্লেয়াররা শেষ পর্যন্ত বড় টিমের আক্রমণের চাপ রুখতে রুখতে দম হারিয়ে ফেলে। বড় টিমগুলো সাধারণত খেলে নিজেদের সমর্থকদের সামনে, এবং নিজেদের পরিচিত মাঠে। এই অবস্থায় ছোট টিমগুলো কতক্ষণ আর রুখতে পারে? আবার এরই মাঝে ফাঁকা গোল পেয়েও নামী টিমের ফরোয়ার্ডদের বাইরে মারার ঘটনারও ইয়ত্তা নেই। ছোট টিমগুলো নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে তেমন জোরালো খেলাও দেখাতে পারে না। ওদের একটিই লক্ষ্য—কোনরকমে গা বাঁচিয়ে খেলে প্রথম ডিভিশন থেকে পিছলে দ্বিতীয় ডিভিশনে না গেলেই হল।

এই রকম খেলা দিনের পর দিন দেখতে দেখতে দর্শকদের মনও হেজেমজে গেছে। এই একঘেঁয়েমিতে বেশ নাড়া দিয়েছে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ। খেলাটি হয়েছিল চুনি গোস্বামীর একাদশ এবং স্টেট ট্রান্সপোর্টের মধ্যে। খেলায় গোল হয়নি। দর্শক জমা হয়েছিল হাজার কুড়ি। সকলেই সন্তুষ্ট। একবাক্যে দর্শকরা স্বীকার করেছে, আহা কী খেলা দেখলাম! ওদের চোখ ঝলসে দিয়েছে প্রদ্যোৎ বর্মণের গোলকীপিং। অরুণ ঘোষ ও প্রশান্ত সিংহের খেলায় একটুও মরচে ধরেনি। চুনি-বলরাম পাশাপাশি খেলার সময়ে মনে হয়েছে ওরা সেই রোম (১৯৬০) ওলিম্পিকের খেলা খেলছে। অসীম

মৌলিকও ওই খেলায় নেমেছিল। খোলাধুলি অসীম বলেছে, "আমি ওই সব গ্রেট প্লেয়ারের সঙ্গে খেলতে পেয়ে নিজেকে গর্বিত মনে করছি।" খেলা শেষে দর্শকরা পুরনো প্লেয়ারদের ছেঁকে ধরেছে। তারা অনুরোধ জানায়, "আপনারা আবার খেলতে নামুন, ময়দানের ফুটবল মাঠের চেহারা পালটে যাবে।"

বলা যায় কলকাতার ময়দানে নতুন প্লেয়াররা তেমন সুবিধা করতে পারছে না। কথাটা তেমন মিথ্যে নয়। তা না হলে বড় টিমগুলিতেও হাবিব, নয়িম, সর্দার, কাম্নান সুভাষ, সুকল্যাণ, শ্যাম বছরের পর বছর খেলে কী করে? ভ্রাতৃসঙ্ঘ টিমেও পুরনো মুখ রয়েছে, যেমন সুশীল সিংহ, ভবানী রায়, কমল সরকার, প্রিয়লাল মজুমদার। আরও টিম খুঁজলে এমন অতি চেনা মুখ আরও পাওয়া যাবে।

তবে ওই অতি পরিচিত প্লেয়ারদের পাশেও কিছু নবীন প্লেয়ারের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তাদের উপর ভরসা করে ভবিষ্যতের ময়দান ফুটবল জমজমাট হবে। এদের মধ্যে কয়েকজন : ভাস্কর গাঙ্গুলী (মোহনবাগান) মানস ভট্টাচার্য, বিদেশ বসু (এরিয়ান), মুনীশ মান্না (জর্জটেলিগ্রাফ), শুভঙ্কর সান্যাল (ইস্টবেঙ্গল), পিনাকী মুখার্জি (কুমারটুলি), বিমল দাস (ইস্টার্ন রেল), বিপ্লব মজুমদার (টালিগঞ্জ অগ্রগামী), তুষার গুণ, উত্তম ঘোষ, প্রশান্ত ব্যানার্জী (কালিঘাট)।

কলকাতার ময়দানে যত হইচই ঘেরা মাঠে প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগের লড়াই নিয়ে। খোলা মাঠে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ডিভিশনের খেলা নিয়ে কজনের আর মাথা ধরে। এবারে প্রথম ডিভিশন লীগ যখন অর্ধেক রাস্তা পর্যন্ত চলেছে, তখন ওই নীচের তিন ডিভিশন লীগ-যুদ্ধ শেষ। ওই খেলাতেও মোটামুটি ভিড় হয়। দর্শকদের চোখে বেশ চমক লাগায়। ক্লাবে ক্লাবে রেষারেষিটাও জমজমাট। তা না হলে বেহালা ইয়ুথ ও বেলেঘাটার দ্বিতীয় ডিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ খেলার আগে চুপি-চুপি গোলপোস্ট কাটার ঘটনা ঘটবে কেন!

প্রথম ডিভিশন ফুটবল নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, তাঁদের কজন জানেন এবারে তৃতীয় এবং চতুর্থ ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন ক্লাব দুটির নাম! তৃতীয় ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঐক্য সম্মিলনী, এবং চতুর্থ ডিভিশনে কালিঘাট ফ্রেন্ডস। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ডিভিশন চ্যাম্পিয়নশিপে একটি অদ্ভুত মিল রয়েছে। প্রতিটি ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ টিমের পয়েন্টের ফারাক মাত্র একটি। আরও অনেক বিষয়ে ওই তিন ডিভিশনের ক্লাবগুলো ভাই-ভাই। বেশির ভাগ ক্লাবেই বুড়ো ও বাতিল প্লেয়ারের ভিড়। অধিকাংশ প্লেয়ারেরই উচ্চাশার লেশমাত্র নেই। অনেক খেলা নিয়েই ঠাট্টা করে 'বন্দোবস্ত' শব্দটা ময়দানে বেশ চালু রয়েছে। নীচের তিনটি ডিভিশনে যেটুকু প্রতিদ্বন্দ্বিতার রেশ, তা সেই উপর দিকেই।

ওই সব কারণে তিনটি ডিভিশনের ৫৫টি ক্লাব থেকে বছর বছর ভাল প্লেয়ার বিশেষ মিলছে না। ময়দানে বেশির ভাগ টিমের শুধু টিঁকে থাকা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। যেটুকু খেলা, তা প্রথম ডিভিশন লীগের টঙের তিনটি টিম নিয়ে। অন্যান্য মরসুমের মতই তাই এবারেও কলকাতা ময়দানে শুধু বল পেটাপিটিই সার হল।

ফুটবলে সেরা শম্ভু

গেল! গেল! ধড়ফড়ানি উঠল সারা ট্রেনটিতে। চিৎকার করছে একদল ছেলে—শম্ভু—উ—উ। খালে পড়েনি ত? দমদম জংশন স্টেশন থেকে ক্যান্টনমেন্টে যাওয়ার পথে এই বিপত্তি; আড়িয়াদহে ফুটবল ম্যাচ শেষে শম্ভু বাড়ি ফিরছিল, ট্রেন থামতে বন্ধুরা ছুটে গেল, দেখলে শম্ভু দিব্যি হাসছে। মন দিয়ে চটির ফিতে আঁটতে ব্যস্ত। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। মনে হল গোল বক্সে গোল-হ্যাংলা ফরোয়ার্ডকে রুখে খামোকা গ্যালারি-শো দিতে সে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। ঘটনাটি বছর খানেক আগের।

মাসখানেক আগের কথা, সেই শম্ভুকে ভেটারেন্স ক্লাবের মনোনীত সেরা জুনিয়র ফুটবলারের ট্রফি নিতে দেখা গেল। ওর পোশাকী নাম—প্রবীর দে। গুছিয়ে একটি ছোট্ট বক্তৃতা দিল—গুরুজনদের সামনে আমার কী আর বলার আছে? স্বপ্নেও এতবড় সম্মান পাওয়ার কথা ভাবিনি। বয়সটা একরত্তিই, সতেরো চলেছে, ময়দানের ঘাস চিনেছে চার বছর। এ বছরই প্রথম ডিভিশনে কালীঘাট ক্লাবে জার্সি পরার প্রথম সুযোগ পেল। রেগুলার প্লেয়ার। মহমেডানের সঙ্গে ম্যাচের দিন ওর উপর ভার ছিল লতিফুদ্দিনের গায়ে চিটে হয়ে লেগে থাকার। বড় প্লেয়ারের গুণগুলো এখন থেকেই সে রপ্ত করছে, বিপক্ষের আক্রমণ ঠেকাতে ঠেকাতে শম্ভু ফাঁক-ফোকর খোঁজে, ফুরসতমত নিজের ফরোয়ার্ডদের বল বাড়িয়ে দেয়। এ সময় শম্ভু খুশিতে ডগমগ থাকে।

দমদম ক্যান্টনমেন্টে মহেন্দ্র কলোনিতে শম্ভুকে সবাই চেনে। সাঁতার জানে, নারকোল গাছে চড়তে ওর ভয় হয়। চুয়ান্ন কেজি। পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি মাথায়। শম্ভু সগর্বে জানাল—ফুটবল খেলে বছরে তিন কেজি ওজন বেড়েছে। খাওয়া নিয়ে বায়নাক্কা নেই। ভাই-বোন ওরা আটটি, পাতে রোজ মাছের জোগান দেখলে চমকে ওঠে। বরিশালেই আদি বাড়ি, প্রাক্তন বিখ্যাত ফুটবলার দুলাল গুহঠাকুরতা ওর দাদু।

মশাল না নৌকো, কার সাপোর্টার? শম্ভুর জবাব—মশাল। সুধীর কর্মকারের খেলা সে মুখস্থ করে। কমার্সের ছাত্র। মধ্যমগ্রাম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল। রেজাল্ট বেরনোর কয়েক সপ্তাহ আগে দেখা, কুছ পরোয়া নেহি ভাব। পরে খবর পেলাম, শম্ভু পাশ করেছে। গোলাকার ফুটবলে ওর এত ভাবভক্তি, অথচ বলে, ভূগোল সাবজেক্টটা কেমন যেন খিটকেলে। শম্ভুর মনে খল-প্যাচ নেই। স্বীকার করল, তার প্রাইজ নেওয়ার দিনের বক্তৃতাটা কোচ সুশীলদাই শিখিয়ে দিয়েছেন।

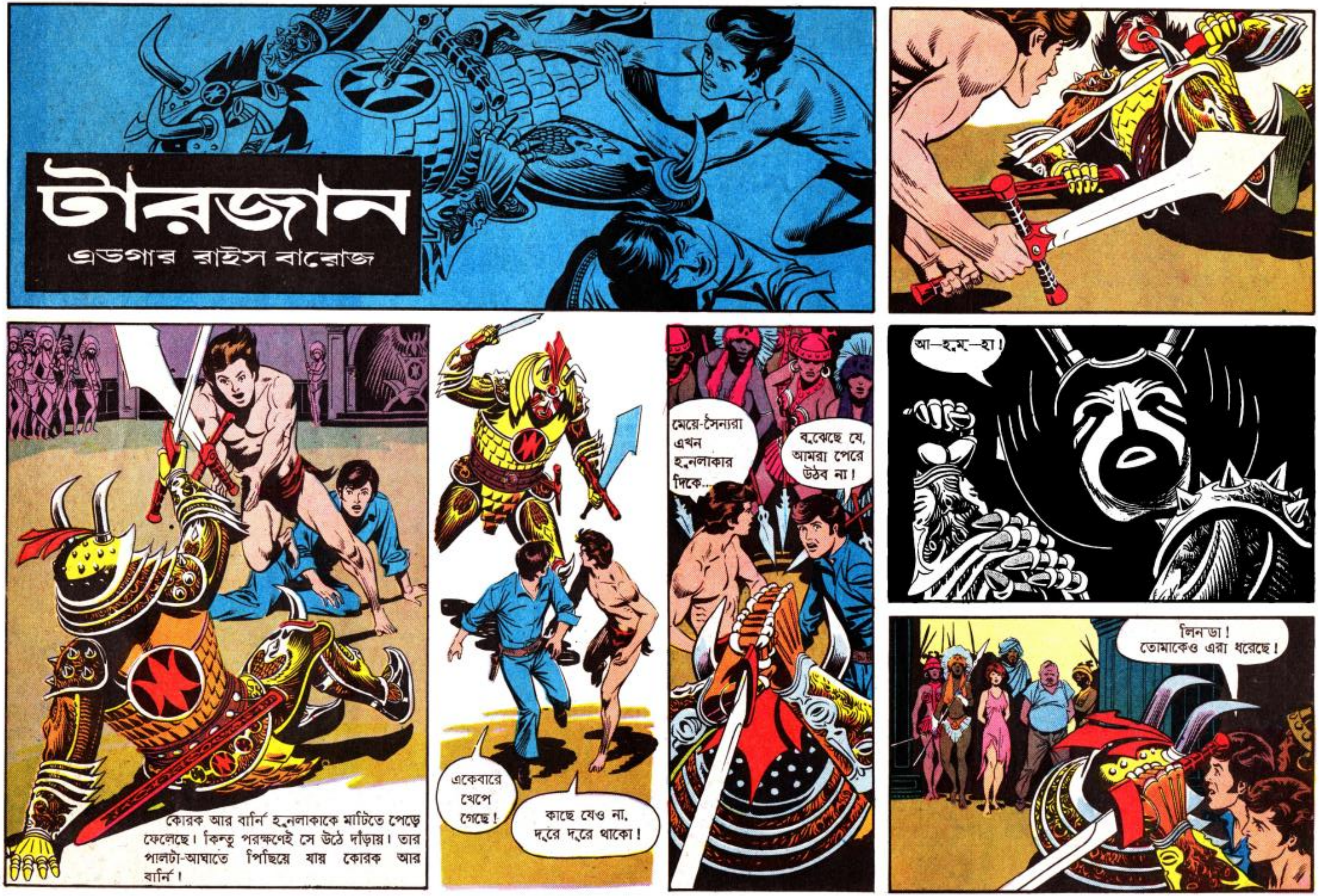
টারজান
এডগার রাইস বারোজ
আ—হুম্—হা!
কোরক আর বার্নি হুনলাকাকে মাটিতে পেড়ে ফেলেছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে উঠে দাঁড়ায়। তার পালটা-আঘাতে পিছিয়ে যায় কোরক আর বার্নি!
একেবারে খেপে গেছে!
কাছে যেও না, দূরে দূরে থাকো!
মেয়ে-সৈন্যরা এখন হুনলাকার দিকে...
বুঝেছে যে, আমরা পেরে উঠব না!
লিনডা! তোমাকেও এরা ধরেছে!

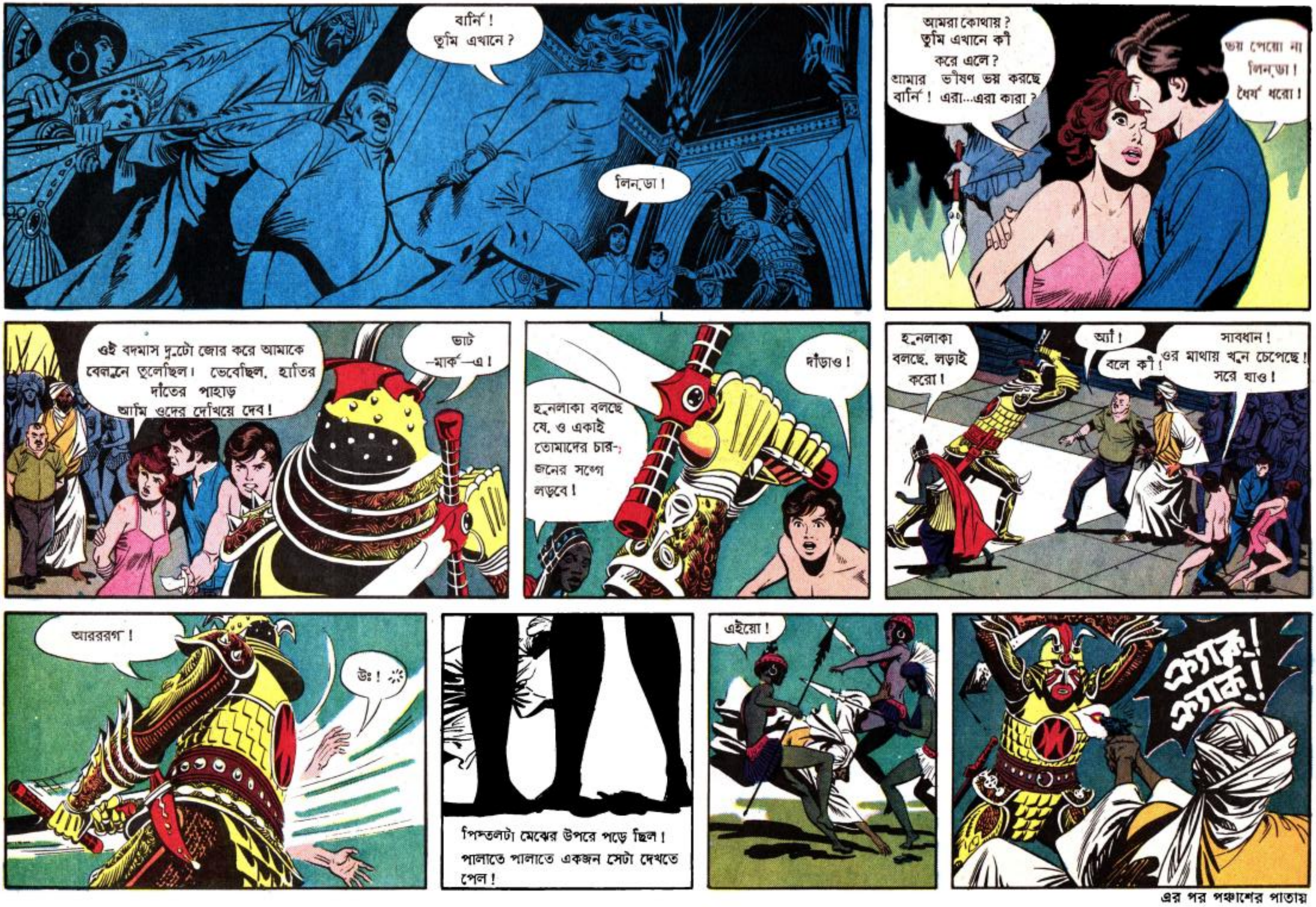
বার্নি !
তুমি এখানে ?
লিনডা !
আমরা কোথায় ?
তুমি এখানে কী
করে এলে ?
আমার ভীষণ ভয় করছে
বার্নি ! এরা...এরা কারা ?
ভয় পেয়ো না
লিনডা !
ধৈর্য ধরো !
ওই বদমাস দুটো জোর করে আমাকে
বেলুনে তুলেছিল। ভেবেছিল, হাতির
দাঁতের পাহাড়
আমি ওদের দেখিয়ে দেব !
ডাট
—মার্ক—এ !
হুনলাকা বলছে
যে, ও একাই
তোমাদের চার-
জনের সঙ্গে
লড়বে !
দাঁড়াও !
হুনলাকা
বলছে, লড়াই
করো !
আঁ !
বলে কী !
সাবধান !
ওর মাথায় খুন চেপেছে !
সরে যাও !
আররররগ !
উঃ !
পিস্তলটা মেঝের উপরে পড়ে ছিল !
পালাতে পালাতে একজন সেটা দেখতে
পেল !
এইয়ো !
ক্যাক !
ক্যাক !

এর পর পঞ্চাশের পাতায়

উমা দাশগুপ্ত

আর্থারের মৃত্যু

ইংরেজী রূপকথায় আর্থার এক আশ্চর্য রাজা ছিলেন। প্রায় পনের'শ বছর আগে ব্রিটেনে রাজত্ব করতেন। যেমন ছিলেন বীর, তেমনি সুন্দর মানুষ। দেবদূতেরা পর্যন্ত আর্থারের উপরে দারুণ খুশী ছিলেন। তাঁর সুখ্যাত তলোয়ার 'এক্‌স্‌ক্যালিবর' ছিল এক দৈবদান : 'একসক্যালিবর' হাতে আর্থার মোট বারোটি যুদ্ধে জয়ী হন। এছাড়া তাঁর বারোজন খুব দুর্ধর্ষ যোদ্ধা 'নাইট্' ছিলেন। তাঁদের বলা হত রাজা আর্থারের গোল টেবিলের নাইট। শেষ পর্যন্ত সেই অপূর্ব বারোজনের একজন নাইটের বিশ্বাসঘাতকায় আর্থারের মৃত্যু হয়। আর্থারের শেষ যুদ্ধ এবং মৃত্যুর বর্ণনা যেমন করুণ তেমন সুন্দর। বিশাল এক হ্রদের ধারে যুদ্ধক্লান্ত বীর যখন মৃত্যুর বুকে ঢলে পড়ছেন ঠিক সেই মুহূর্তে আশ্চর্য এক জাদু-নৌকোয় পরীর দেশের তিনজন রানী ভেসে এলেন। যত্ন করে তাঁরা তাঁদের স্নেহের আর্থারকে নৌকোয় তুলে নিলেন। নৌকা ভেসে গেল অ্যাভালন দ্বীপের দিকে। রূপকথায় বলে, অ্যাভালন দ্বীপে যাঁরা যান, তাঁরা আবার ফিরে আসেন। রূপকথার পাঠকেরা চান না আর্থারের মৃত্যুকে মেনে নিতে। তাই আর্থারের সমাধির উপর লেখা রইল : 'এখানে রইলেন আর্থার, যিনি রাজা ছিলেন এবং চিরকাল রাজা থাকবেন।' দ্যাখো, আমি কেমন সুন্দর একটা মৃত্যুতে মুগ্ধ হয়ে একেবারে শেষের থেকে গল্প শুরু করছি! ধরেই নিচ্ছি, আর্থারের গোড়ার কথা জানতে তোমাদের এখন খুব ইচ্ছে করছে।

⁂

আর্থারের বাবা উথার যখন ব্রিটেনের রাজা, তখন সেখানকার জীবন ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। উথার নিজে মানুষ ভাল ছিলেন, কিন্তু সেই দুর্দশা থেকে দেশকে তিনি কিছুতেই উদ্ধার করতে পারেননি। রাজা নিজেই পড়েছিলেন মহা বিপদে। এক জাদুকরের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সমস্ত কাজ করতেন। জাদুকরের নাম মার্লিন। শিশুপুত্র আর্থারকে তিনি মার্লিনের জিম্মায় দিয়ে দেন। তা না-হলে আর্থারের ভবিষ্যৎ কী হত কে জানে। একমাত্র মার্লিনই জানতেন যে, আর্থার রাজপুত্র। তিনি ওই শিশুকে নাইট্ স্যার একটরের বাড়িতে রেখে এলেন। আর্থার হয়ে গেলেন একটরের পালিত পুত্র। উথার যখন মারা যান, তখন কে রাজা হবে সেটা হয়ে দাঁড়ালো আরো একটি সমস্যা। ইতিমধ্যে শিশু আর্থার বড় হয়েছে এবং সেই জাদুকর-বন্ধুর সাথে একদিন এক হ্রদের ধারে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দেখলেন, আশ্চর্য সুন্দর একটি হাত ঝক্‌মকে একটি তলোয়ার ধরে জলের উপর ভেসে উঠেছে। মার্লিন আর্থারকে বললেন, 'তুমি সাঁতরে গিয়ে ওই তলোয়ার নিয়ে এস। ওই তোমার এক্‌স্‌ক্যালিবর। ওই তলোয়ারই ব্রিটেনে শান্তি ফিরিয়ে আনবে।' আর্থার তাই করলেন। এক্‌স্‌ক্যালিবর হাতে এল। কিন্তু আর্থারকে তখনও কেউ রাজা বলে স্বীকার করে না। যারা তাঁকে চেনে তারা জানে যে, আর্থার স্যার একটরের ছেলে। জাদুকর মার্লিন ফন্দী করলেন যে, ওই এক্‌স্‌ক্যালিবরের সাহায্যে আর্থার ব্রিটেনের রাজা হবেন। লণ্ডনের আর্চবিশপকে রাজী করিয়ে দৈবতলোয়ারটিকে মার্লিন সেণ্ট্‌পল গির্জার বাগানে একটি পাথরে অর্ধেক পুঁতে রেখে দিয়ে এলেন।

উথারের মৃত্যুর পর আর্চবিশপ ইংল্যাণ্ডের সমস্ত বড়-বড় সব অভিজাত মানুষদের সেণ্ট্ পল্ গির্জায় ডেকে পাঠালেন। বললেন, যে ওই তলোয়ারটিকে পাথর থেকে টেনে বের করতে পারবে, সেই হবে ব্রিটেনের রাজা। এত শত প্রতিপত্তিশালী মানুষেরা কিন্তু কেউ তা পারলেন না ; বিফল হয়ে রাগে গর্জন করতে থাকলেন। এমন সময় হঠাৎ একটি যুবক উপস্থিত হল মার্লিনের সাথে। যুবকটির গায়ে ছেঁড়া পোশাক। অথচ তলোয়ারটিকে সে একটানে বের করে আনল। আর্চবিশপ তখন সকলকে ওর আসল পরিচয় দিলেন। 'উনি হলেন আর্থার, রাজা উথারের পুত্র।' অভিজাত ব্যক্তিরা তো তাজ্জব। তার উপরে মহা খাপ্পা। আর্থারের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই লড়াই বাধিয়ে দিলেন তাঁরা। তার উপরে বাইরে থেকে প্রতিবেশী স্যাক্সনেরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ব্রিটেন আক্রমণ করতে থাকলো। তাদের বিরুদ্ধে আর্থার সমানে লড়াই করে গেলেন। এক্স্‌ক্যালিবরের সামনে আর্থারের শত্রুপক্ষ, কী ব্রিটন কী স্যাক্সন, দাঁড়াতে পারল না। কিংবদন্তী বলে যে, বেডন পাহাড়ের যুদ্ধে রাজা আর্থার যখন স্যাক্সনদের প্রচণ্ড ভাবে হারিয়ে দেন, তখন তিনি নিজের হাতে ৯৬০ জন যোদ্ধাকে বধ করেছিলেন। অবশ্য শত্রুবধই আর্থার কিংবা তাঁর নাইট্‌দের একমাত্র কীর্তি নয়। দেশে শান্তি ফেরামাত্র আর্থার তাঁর নাইট্‌দের দরিদ্র-অসহায়দের সেবায় লাগিয়ে দিলেন। এতদিন যারা অত্যাচারে অস্থির হয়ে ছিল, তারা উৎসাহে এগিয়ে এল। বিধবা, মাতৃহারা ছেলে, গরিব সকলে। ভাল রাজা, বীর রাজা তাদের বাঁচিয়ে তুলবেন। আর্থারের নাইটরা এক-একটি চমকপ্রদ 'উদ্ধারের' কাজে বনে, জঙ্গলে, প্রাসাদে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লেন। দেশে শান্তি ফিরলো, আর্থারের রাজত্ব জমে উঠল।

* * *

কিন্তু টিক্‌ল না। পৃথিবীর বোধহয় এই একটিমাত্র রূপকথা, যার শেষ হল ধ্বংসে এবং মৃত্যুতে! খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে আর্থারের শত্রুসংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল। তাঁরই একজন নাইট্, সেই শুভ বারোজনের একজন, বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠলেন। নাইট মড্রেড্। আবার শুরু হল সেই সাংঘাতিক যুদ্ধ, মড্রেডের দলের বিরুদ্ধে আর্থার প্রায় একা হয়ে পড়েছিলেন। আর্থার কিন্তু হারেননি। ব্রিটেনের যত অভিজাত যোদ্ধা তাঁর বিরুদ্ধে গেলেন, সকলেই প্রায় নিশ্চিহ্ন হলেন। শেষ লড়াই হল মড্রেড বনাম আর্থার। মড্রেডকে শেষ করে রাজা আর্থার নিজে জখম হলেন। তিনি বুঝলেন মৃত্যু আসন্ন, তাঁর পাশে তাঁর শেষ বিশ্বস্ত বন্ধু নাইট্ বেডোভিয়ার। আর্থার বেডোভিয়ারকে বললেন, 'এক্স্‌ক্যালিবর আর লড়াই করবে না। তুমি এই তলোয়ার ছুঁড়ে হ্রদের জলে ফেলে দাও।' বেডোভিয়ারের এই আদেশ পালনে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু রাজার শেষ আদেশ ঠেলতে পারলেন না। এক্স্‌ক্যালিবরকে ছুঁড়ে দিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন, হ্রদের ভিতর থেকে একটি সুন্দর হাত উঠে এল, তলোয়ারটিকে ধরে মুহূর্তে জলের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। এর পরে বেডোভিয়ার আরেকটি অলৌকিক ঘটনা দেখলেন। আর্থারের মহাপ্রয়াণ। আমার গল্পের শুরুতেই তোমাদের সেই ঘটনাটার কথা বলেছি।

গল্পের শেষে এবারে ইতিহাসে আসা যাক। রূপকথা বড় সুন্দর। রূপকথায় অনেক কিছুই বিশ্বাস করা চলে। অথচ ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই বই পড়ে মাটি খুঁড়ে বিশ্বাসগুলি তছনছ করে দেয়। সবটুকু অবশ্য ধ্বংস হয় না। আর্থারের রূপকথায় ইংরেজ ইতিহাসের এক অন্ধকার যুগের ছায়া রয়েছে। ইংল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসী ব্রিটনরা আক্রমণকারী স্যাকসন্‌দের হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দীর শেষে এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমে আর্থার নামে একজন যোদ্ধা-নেতার অধীনে ব্রিটনেরা বেশ কিছুদিন স্যাকসনদের হটিয়ে রেখেছিলেন। বেডন পাহাড়ের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। আর্থারের অন্যান্য কিছু কৃতিত্বও ঐতিহাসিক সত্য বলেই মনে হয়। কিন্তু একথাও অস্বীকার করে লাভ নেই যে, ঐতিহাসিক আর্থারকে আমরা সামান্যই চিনি। আর্থার রাজা ছিলেন না, বড়জোর সেনাপতি ছিলেন। অষ্টম শতাব্দী থেকে লেখা একাধিক ঐতিহাসিক বর্ণনায় তাঁর নাম এবং তাঁর সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য দৈবঘটনাগুলি ঘটেনি। এমন কথা মনে করার কারণ আছে যে, আর্থারের সঙ্গে খৃষ্টান চার্চের ঝগড়া হয়েছিল। মঠের সন্ন্যাসীরাই আবার ইতিহাস লিখতেন। সমাজে 'লেখক' বলতে তখনকার যুগে শুধুমাত্র মঠের লোকেরাই ছিলেন। আর্থারের অজস্র যুদ্ধে খৃষ্টান মঠগুলি সমর্থন জানায়নি। সেজন্য যে বিরক্তি দু'পক্ষে জমেছিল, তার ফলেই হয়ত আর্থারের কোনো জীবনী রচিত হয়নি। রূপকথার আর্থারকে দেবতারা ডেকে নিয়েছিলেন ; ইতিহাসের আর্থারের কাহিনী অন্যরকম। তিনি গির্জার আশীর্বাদ পাননি। ইতিহাসে ব্রিটনেরা শেষ পর্যন্ত স্যাক্সনদের ঠেকাতে পারেননি। বোধকরি সেইজন্যেই আর্থারের রূপকথা শেষ হয় ধ্বংস এবং মৃত্যুতে। এই সুন্দর করুণ মৃত্যু-গল্পটিতে বহু শতাব্দী আগের এক পরাজিত সমাজের মৃত্যুর নিশানা রয়েছে। তারা ভেবেছিল, ফিরে আসবে, কিন্তু তারা ফেরেনি।

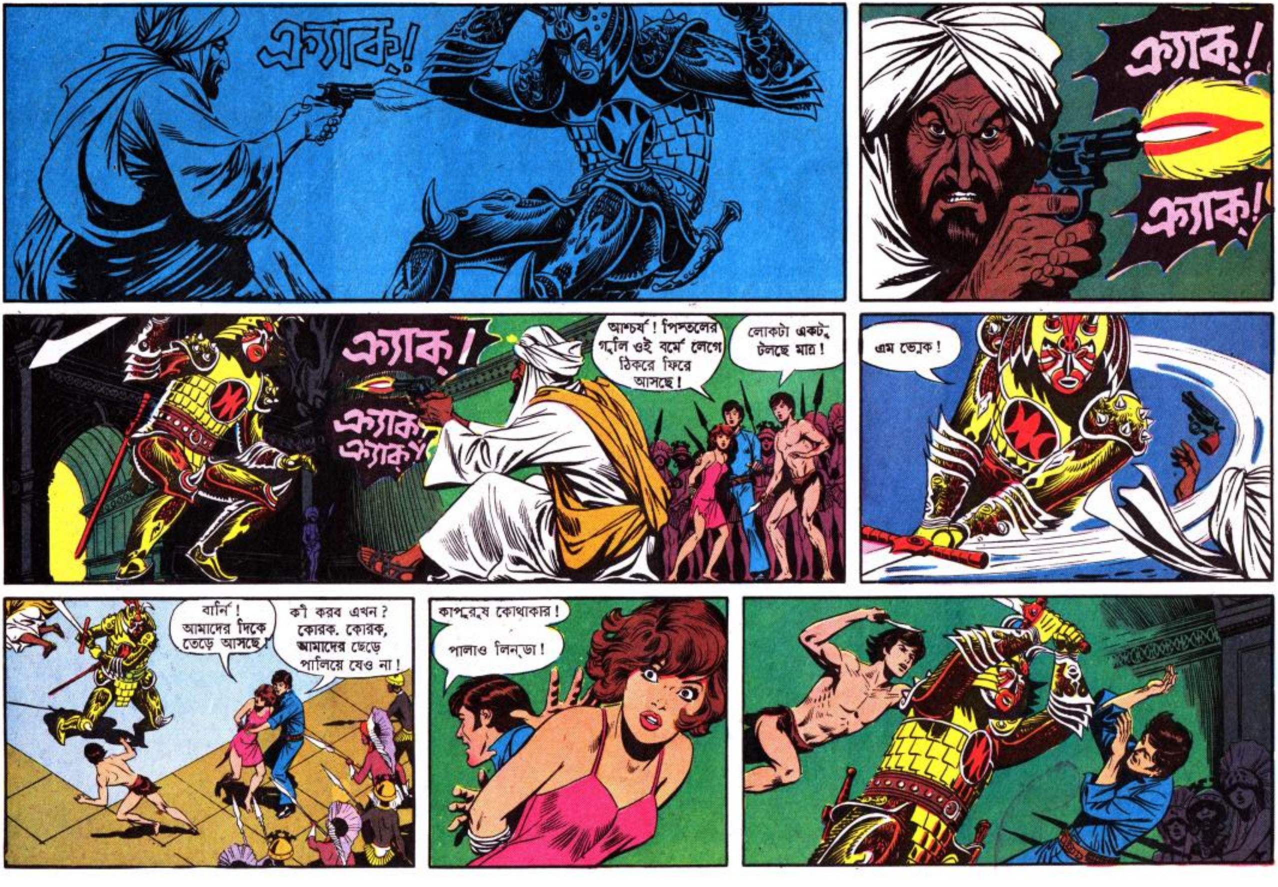
এ্যাক্!
ক্র্যাক্!
ক্র্যাক্!
ক্র্যাক্!
ক্র্যাক্ ক্র্যাক্!
আশ্চর্য ! পিস্তলের গুলি ওই বর্মে লেগে ঠিকরে ফিরে আসছে !
লোকটা একটু টলছে মাত্র !
এম ভোক !
বার্নি ! আমাদের দিকে তেড়ে আসছে !
কী করব এখন ? কোরক. কোরক, আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যেও না !
কাপুরুষ কোথাকার !
পালাও লিন্ডা !

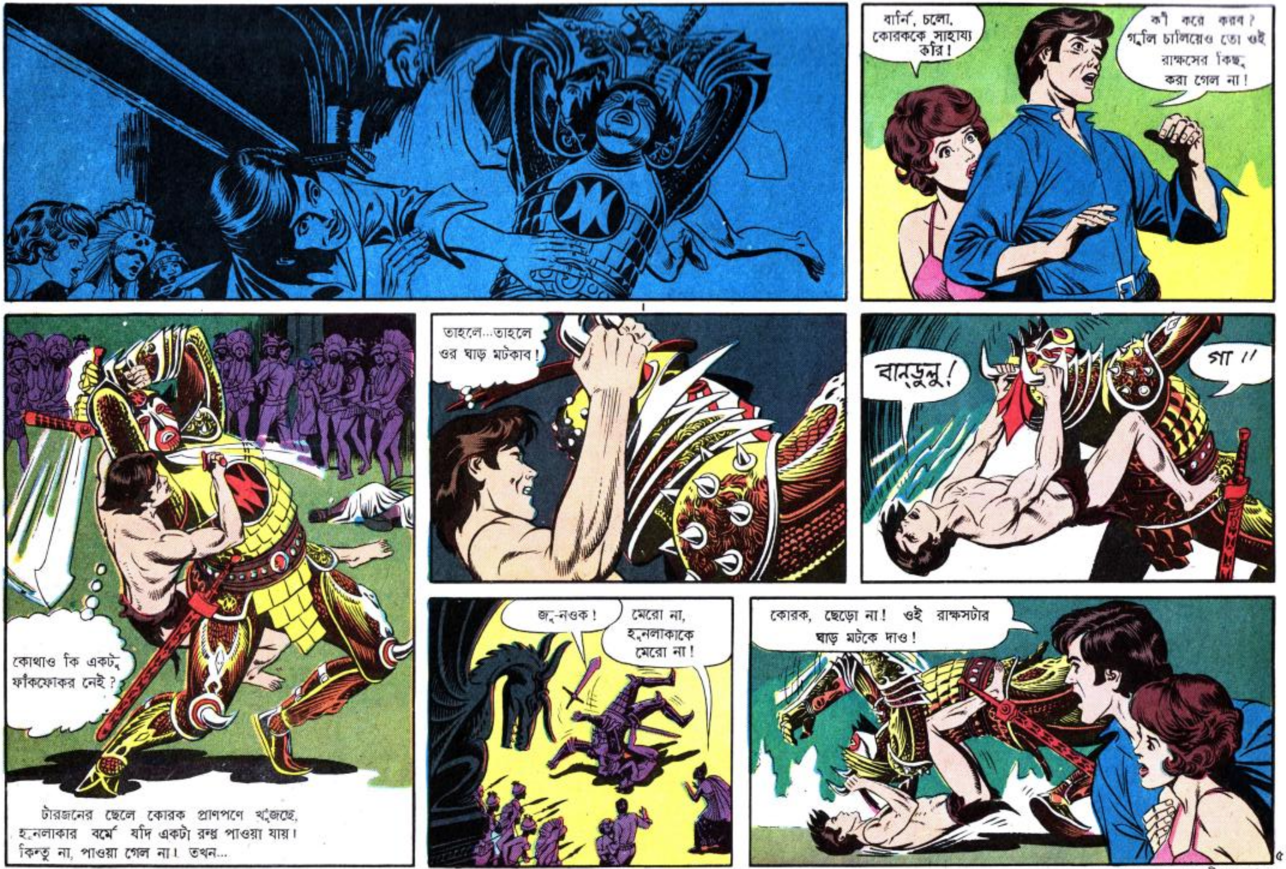
বার্নি, চলো,
কোরককে সাহায্য করি!
কী করে করব? গুলি চালিয়েও তো ওই রাক্ষসের কিছু করা গেল না!
কোথাও কি একটু ফাঁকফোকর নেই?
টারজনের ছেলে কোরক প্রাণপণে খুঁজছে, হুনলাকার বর্মে যদি একটা রন্ধ্র পাওয়া যায়। কিন্তু না, পাওয়া গেল না। তখন...
তাহলে...তাহলে ওর ঘাড় মটকাব!
বানডুলু!
গা!!
জু-নওক!
মেরো না, হুনলাকাকে মেরো না!
কোরক, ছেড়ো না! ওই রাক্ষসটার ঘাড় মটকে দাও!

এর পর আগামী সংখ্যায়

আজব চিড়িয়াখানা

বহুরূপী

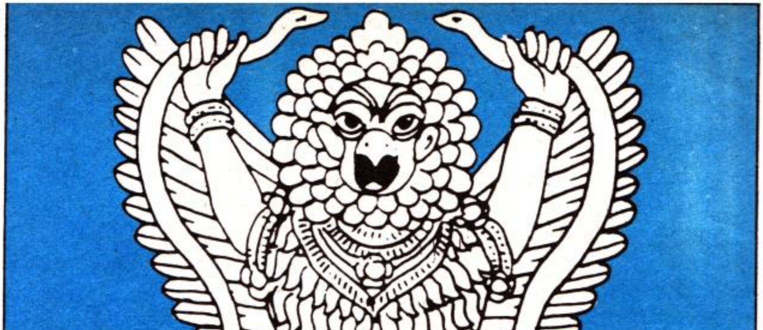

চেনা-চেনা ঠেকছে,—তাই না ?

ইনি আমাদের গরুড়। পাখিদের রাজা। বিষ্ণুর বাহন। সাপের যম। ফর্সা মুখ, টুকটুকে লাল পাখা, সোনালী রঙের শরীর। গরুড় অর্ধেক পাখি, অর্ধেক মানুষ। হাত দু'খানা যদি তার মানুষের মতো, পায়ে তবে পাখির মতো নখ। পরদেশীরা তাই গরুড়ের ছবি দেখে চমকে ওঠেন ভাবেন—বুঝিবা কোনও আজগুবি প্রাণী। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের কাছে গরুড় পাখি-মানুষ হয়েও না-পাখি, না-মানুষ। তিনি প্রায় দেবতার সামিল। যেমন গুণী, তেমন জ্ঞানী।

গরুড়ের বাবার নাম কশ্যপ মুনি। মায়ের নাম—বিনতা। সাপদের সঙ্গে শত্রুতা, তার কারণ সাপদের মা কদ্রু ছিলেন তাঁর বিমাতা। তিনি চালাকি করে গরুড়ের নিজের মা বিনতাকে দাসী বানিয়ে রেখেছিলেন। গরুড় মা বলতে পাগল। ঠিক করেন যে, স্বর্গ থেকে অমৃত এনে মাকে মুক্ত করবেন। সুতরাং পাখা মেলে চললেন স্বর্গের দিকে। কিন্তু দেবতারা চট করে তাঁকে অমৃত ছেড়ে দিতে রাজী হবেন কেন ? কে না জানেন, অমৃতের কলসি অন্যের হাতে তুলে দেওয়া মানেই তাকে অমর করে দেওয়া। একবার দু ফোঁটা খেতে পারলেই হয়ে গেল, যে খাবে সে আর মরবে না। সুতরাং জোর লড়াই হলো। কিন্তু দেবতারা গরুড়ের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত দেবতাদের রাজা ইন্দ্র বজ্র ছুঁড়ে মেরেছিলেন। তাতেও গরুড়ের কিচ্ছু হলো না। ইন্দ্রের সম্মান রাখতে তাঁর একটা পালক খসে পড়েছিল মাত্র !

অমৃত নিয়ে গরুড় সোজা এসে হাজির হলেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু তো অবাক। ছেলেটা হাতে পেয়েও অমৃত নিজে একটু খেল না,—অদ্ভুত ছেলে বটে ! তিনি বললেন—অমৃত না খেলেও আজ থেকে তুমি অমর। আর এখন থেকে তুমিই আমার বাহন। গরুড় সেই থেকে বিষ্ণুর উড়োজাহাজের মতো। বিষ্ণুকে নিয়ে কাঁহা কাঁহা উড়ে চলেন।

অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করেছেন গরুড়। সব বলতে গেলে দিস্তা দিস্তা কাগজেও কুলোবে না। ক্রমে সব জানতে পারবে। রামায়ণ মহাভারতে গরুড়ের অনেক গল্প রয়েছে। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় লক্ষণ যখন সাপের বাঁধনে পড়ে ছটফট করছেন, তখন কে তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন ? —তিনি এই গরুড়।

গরুড় কোনও আজব প্রাণী নয়, আসলে আমাদের মনের মতো একটি পাখি। মানুষও পাখির মতো উড়ে যেতে চায় সূর্যের দিকে। মনে মনে মানুষ তা-ই কল্পনা করেছিল এমন মানুষ, যে পাখির মতো উড়তে পারে, স্বর্গ থেকে নিয়ে আসতে পারে অমৃত। আমরা বলি প্যাঁচার মতো মুখ, টিয়ার মতো ঠোঁট। মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা যখন কখনও-কখনও পাখির আদল দেখতে পাই, তখন পাখির মধ্যেই বা মানুষের ভাব থাকতে পারবে না কেন ?

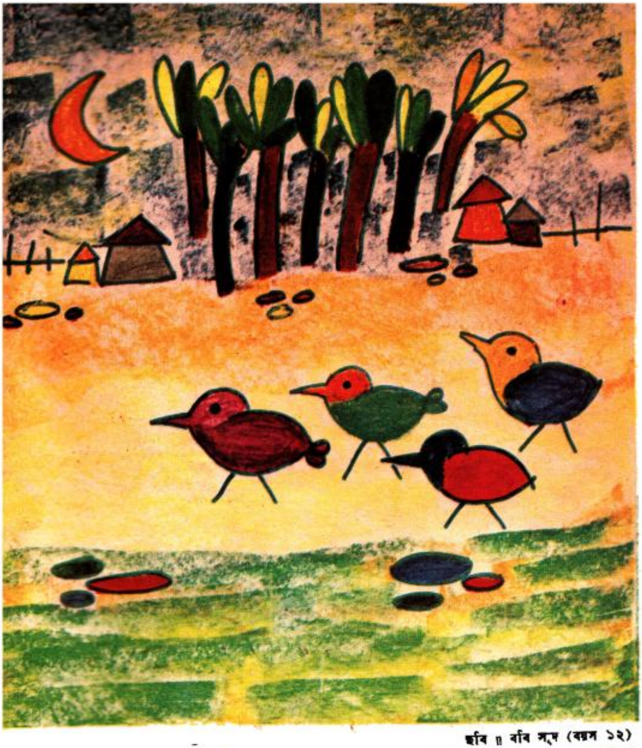

ছবি ॥ ববি সুদ (বয়স ১২)

আনন্দের দিন

আজ আমাদের কি আনন্দের দিন!
পিক্‌নিকেতে গিয়ে তো ভাই
কাটছে সারাদিন
ময়দা মেখে লুচি বেলছি,
মণ্ডা মেঠাই গালে ফেলছি
ইচ্ছে করে এই মাঠেতে কাটুক সারাদিন
আজ আমাদের কি আনন্দের দিন!

অনিরুদ্ধ রায়
বয়স—১৩

লেখা

লিখতে কিছুই জানি না,
হাতে মেখে কালি,
খাতা কলম খুলে,
বসে থাকি আকাশের পানে চেয়ে।

মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স—৯)

আমি একটা পেন

কোম্পানির আরও প্রায় দু ডজন পেনের সাথে এসে আমি কোলকাতার এক অখ্যাত দোকানে পড়ে আছি। আমার গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। আমার নিবটা একদম সোনালী আর মুখটা খুব সরু। আমার ঢাকনার উপর একটা রুপালি ফুটকি আছে। ব্যস্ এই হল আমার পরিচয়।

প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল দোকানটায় পড়ে আছি। আমার প্রতিবেশী বহু পেন এর মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে। আমার দাম কিন্তু ওদের চেয়ে বেশী, তাই বিক্রি হতে এত দেরি।

এখন একজন ভদ্রলোকের পকেটে চড়ে আমি যাচ্ছি। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ হল আমায় দোকান থেকে কিনে এনেছেন। ভদ্রলোকের জামা থেকে বেশ ভুর ভুর করে সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে, আরে ওই যে বাস এসে গেছে। ভদ্রলোকটি উঠে পড়লেন। আমার জীবনে এই প্রথম বাসে চড়া। কলকাতার বাসে এত ভিড় তা আগে আমার ধারণা ছিল না। ঠাসাঠাসিতে আমার দম আটকে যাবার জোগাড়। একি! একটা কালো লোমশ হাত আমায় তুলে নিচ্ছে কেন? এতো ভদ্রলোকের হাত নয়। নিশ্চয় চোর, তোমরা যাকে বল পকেটমার। ইস্, ভদ্রলোক আমায় এত দাম দিয়ে কিনলেন আর বেটা আমায় চুরি করে নিচ্ছে। আমি যদি কথা বলতে পারতাম! হায়, সে গুণ বিধাতা আমায় দেয়নি!

আবার আমি একটা দোকানে। সেই পকেটমারটা আমায় এখানে বিক্রি করে দিয়েছে। তোমাদের দেশে এরকমভাবে একটা চোর একজন লোকের ক্ষতি করল? তোমরা এর প্রতিকার করতে পার না?

এখন একটা ছেলের পড়ার টেবিলে পড়ে রয়েছি আমি। প্রায় পাঁচ ছদিন আগে দোকানী আমায় এই ছেলেটার কাছে বেচে দিয়েছে। তখন থেকে আমি এখানে আছি। ছেলেটার টেবিলে অনেক বইপত্তর রয়েছে তার মধ্যে তোমাদের 'আনন্দমেলাটা'ও খুঁজে পেয়েছি আমি। আমি যদি তোমাদের মত পড়তে জানতাম তাহলে আনন্দমেলাগুলোকে এতদিনে......। ছেলেটার কাল থেকে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ও আমাকে দিয়েই পরীক্ষায় লিখেছে।

আজ ছেলেটার পরীক্ষা শেষ। আমরা অর্থাৎ আমি ও ছেলেটা এখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ির দিকে যাচ্ছি। ছেলেটার যে পকেটে একটা সুন্দর কাজ করা রুমাল আছে আমিও সেই পকেটে। ছেলেটা রুমাল বার করবার জন্যে পকেটে হাত ঢুকিয়েছে, একি! আমি ছেলেটার পকেট থেকে পড়ে যাচ্ছি। আমি চিৎকার করতে গেলাম। পারলাম না। ছেলেটা চলে যাচ্ছে রুমাল দিয়ে মুখ পুছতে পুছতে। আমার দিকে ফিরেও দেখল না। অথচ ওর সব লেখা আমি লিখে দিয়েছি এই সোনালী নিবটা দিয়ে। এই, একটা গাড়ি আসছে। উঃ কি অপরূপ! ওর বড় চাকাটা ক্রমশ আমার দিকে এগিয়ে আসছে, আসছে, আসছে......!

প্রচেত গুপ্ত
(১১ বৎসর)

রাজায় রাজায়

কি করে দাবা খেলতে হয়

কোন ঘুঁটির কোন্ চাল সবই বলা হল, সেগুলি সংক্ষেপে আবার বলে নেওয়া যাক্। ঘোড়া চলে আড়াই ঘর—যে কোন দিক দু ঘর সোজাসুজি বা পাশাপাশি গিয়ে বাঁ দিকের বা ডান দিকের ঘরে ঘোড়া যেতে পারে। ঘোড়া অন্য ঘুঁটিকে ডিঙিয়ে যেতে পারে। গজ যায় কোনাকুনি, নৌকো যায় পাশাপাশি, মন্ত্রী যায় কোনাকুনি বা পাশাপাশি। রাজা যায় যে-কোন দিকে এক ঘর। এছাড়া, রাজা কাস্‌ল করতে পারে।

বোড়ে সম্পর্কে বলা হয়েছে, বোড়ে কেবল সোজা উপরের দিকে যায়, প্রত্যেকটি বোড়ের প্রথম চালে দু ঘর ইচ্ছা করলে যেতে পারে, নইলে এক ঘর করেই তাকে এগুতে হবে। কেবল মারার সময় বোড়ে কোনাকুনি মারতে পারে। এ ছাড়া, বোড়ের আর একটা নিয়মের কথা বলা হয়নি, সেটা এখানে বুঝিয়ে বলা হচ্ছে।

বোড়ে এককালে এক ঘর করেই এগুতো, ফলে কোন বোড়ে প্রতিপক্ষের বোড়েকে পাশ কাটিয়ে মারায় সুযোগ না দিয়ে চলতে পারত না। কিন্তু পরে যখন নিয়ম বদলে গেল, অর্থাৎ, বোড়েগুলির প্রথম চালে ইচ্ছে করলে দু ঘর যাবার নিয়ম করা হল, তখন দেখা গেল সাদা বোড়ে যখন পঞ্চম ঘরে গিয়ে বসেছে তখন কালো বোড়ে যেটা এখনো একটি চালও দেয়নি, সে হঠাৎ দু ঘর বাড়িয়ে দিয়ে সাদা বোড়ের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে। কালো বোড়ে কালোর দিক থেকে পঞ্চম ঘরে পৌঁছুলেও তার পাশের ঘরের সাদা বোড়ে যার এক-বারও চাল হয়নি সেও দুঘর গিয়ে কালো বোড়েটির পাশ কাটাতে পারে। যাতে এইরকম দুঘর চাল দিয়ে পাশ কাটাতে না পারে সেজন্য একটা নতুন নিয়ম করা হল—সেটি হল, যে বোড়ে দু ঘর চাল দিয়ে প্রতিপক্ষের বোড়ের পাশ কাটিয়ে চলে গেল, ঠিক তার পরের চালে সেই বোড়েটিকে এক ঘর নামিয়ে এনে প্রতিপক্ষ মেরে দিতে পারে। এ ব্যাপারটা শুনতে একটু কঠিন মনে হতে পারে, তবে খেলবার সময় একটু খেয়াল রাখলেই অসুবিধে হবার কোন কারণ নেই। মনে রাখতে হবে, যে বোড়েটি দু ঘর চাল দিয়ে প্রতিপক্ষের বোড়ের পাশ কাটাতে চায়, প্রতিপক্ষের সেই বোড়েটিকে এক ঘর নামিয়ে নিয়ে মেরে দেওয়ার স্বাধীনতা থাকে, তবে যে চালে এরকম দু ঘর চাল দেওয়া হয়েছে, ঠিক তার পরের চালেই প্রতিপক্ষকে এটা করতে হবে, নইলে পরে ঐ বোড়েটিকে নামিয়ে নিয়ে মারা যায় না। ফরাসী ভাষায় একে বলা অঁ পাসাঁ, এই নিয়মটি বিশ্ব দাবা নিয়মের একটা বিশেষত্ব।

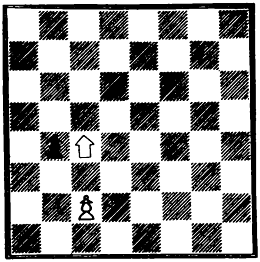

দেখা যাচ্ছে কালো বোড়ে কালোর দিক থেকে পঞ্চম ঘরে এগিয়ে এসেছে, সাদা বোড়ে এখনও চাল দেয়নি। সাদা বোড়ে যদি এখন দু ঘর এক সঙ্গে চাল দিয়ে তীর চিহ্নওলা ঘরে যায় তাহলে...

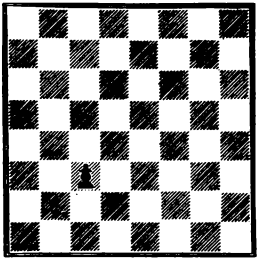

কালো বোড়ে সাদা বোড়েকে (সাদার দিক থেকে দেখলে) এক ঘর নামিয়ে মেরে দিয়েছে। যেন সাদা বোড়েটি চাল দিয়ে মাত্র এক ঘর এগিয়ে ছিল। একে বলে অঁ পাসাঁ। এই কথাটার বাংলা নেই, তাই এ বিদেশী কথাটিকেই ব্যবহার করতে হবে।

বোড়ে যখন অষ্টম বা শেষ ঘরে পৌঁছে যায় তখন আর সেটি বোড়ে থাকে না। তখন বোড়েটিকে যে-কোন একটি বলে রূপান্তরিত করা যায়। বোড়েটি অষ্টম ঘরে পৌঁছুলে সেটিকে মন্ত্রী করা যায়, বা নৌকো, গজ কিংবা ঘোড়াও করা যায়। বোরডে যদি একটি মন্ত্রী থাকেও তাহলেও আর একটা মন্ত্রী করা যায়। কেবল দুটো নয়, খেলার সময় বোড়ের সাহায্যে কেউ আরও মন্ত্রী তুলতে পারে, তবে আসল খেলায় এরকম ঘটনা কমই ঘটে। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে আবার মন্ত্রীর বদলে নৌকো, গজ, কিংবা ঘোড়া তুলতে হয়। সেটা নির্ভর করে ঘুঁটিগুলির অবস্থানের উপর।

—দিগ্‌দর্শক

তোমাদের মনের মতো রঙীন পূজাবার্ষিকী

আনন্দমেলা

অপেক্ষা করো আর কয়েকটা দিন, আসছে আনন্দমেলা : পুজোর হৈ-চৈ মজার মধ্যে তোমাদের সারাক্ষণের সঙ্গী ! রঙে-রেখায় আর মন-ভোলানো লেখায় এবারের আনন্দমেলা রঙীন পূজাবার্ষিকী গত বছরের চেয়েও অনেক বেশী জমজমাট। পুরো খবর ক্রমশ বেরুবে, কিন্তু বিশেষ-বিশেষ লেখাগুলো সম্পর্কে এখনই জেনে রাখো :

মাধুরীলতার চিঠি

রবীন্দ্রনাথের বড় মেয়ে মাধুরীলতা যখন তোমাদের মতো ছোট্টটি ছিলেন,
তখন বাবার কাছে লেখা তাঁর কুড়িখানি চিঠি।

চারটি বড় উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়, সুবোধ ঘোষ, মতি নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তিনটি মস্ত বড় গল্প ও একটি রূপকথা

প্রেমেন্দ্র মিত্র, শংকর, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শৈলেন ঘোষ

এছাড়াও অন্নদাশংকর রায়, অমিতাভ চৌধুরী ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ছড়া, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণ-কাহিনী, তোমাদের প্রিয় লেখকদের অনেকগুলো গল্প, বিখ্যাত খেলোয়াড়দের দেওয়ালে-টাঙিয়ে-রাখবার-মতো ছবি, ধাঁধা, ম্যাজিক, আরও কতো কী! এবারের সবচেয়ে বড় আকর্ষণের কথাটা কিন্তু এখনও বলা হয় নি। তা হলো:

পরীক্ষার্থীদের জন্যে

হায়ার-সেকেনডারি ও স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা সম্পর্কে এমন একটি লেখা যাতে বেশী-বেশী নম্বর পাবার কায়দাগুলি শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই লেখাটির পুরো বিবরণ যখন বেরুবে, তখন আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী পড়বার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবেই।

আজই যিনি তোমাদের কাগজ দেন তাঁকে ব'লে রাখো,
বা, আমাদের লেখো :
সার্কুলেশন ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১

আনন্দমেলা

দাম : ৮.০০ টাকা ॥ সডাক : ৯.৪০

AMC. 3BEN

REGD. NO. WB/CC 264
ANANDAMELA
দেড় টাকা

আনন্দমেলা